"নারী উন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

২৫/৯/১০ ই

ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দা আলো বেগম
এম .ফিল গবেষক
রেজিষ্ট্রেসন নং-১৪৫
সেশন-২০০২-২০০৩
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449256

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
449256

(ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হলো)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টম্বর-২০১০

449256

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ :

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,সৈয়দা আলো বেগম,রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশবিদ্যালয় কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত 'নারী উন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ শীর্ষক গবেষনা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।আমার জানামতে,এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষনা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন
২৬/৯/১০ ই
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449258

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষনা করছি যে,আমি সৈয়দা আলো বেগম,এম ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এম ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "নারী উন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ "শীর্ষক আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ড.খন্দকার নাদিরা পারভীন, অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষনা করেনি।এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রীর জন্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

449250

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিনীত
সৈয়দা আলো বেগম
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্ত:পুরবাসী নয় বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। বাংলাদেশের নারী সমাজ যুগযুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী সামাজিক কুসংস্কার নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়নে নেয়া হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন গুলো পূরন করতে ও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে থাকে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। এই বাস্তবতা লক্ষ করে একজন নারী হিসেবে নারী উন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষা নিয়ে আমার দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে গবেষণাকে সফলভাবে শেষ করতে পেরে ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দ বোধ করছি ।

যে কোন গবেষণা কর্মে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান থাকে। প্রথমে মনে পড়ছে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ খন্দকার নাদিরা পারভীনের কথা। এমন একজন মহান ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারীনি মানুষটিকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।তাঁর অবদান ও তত্ত্বাবধান ছাড়া এই অভিসন্দর্ভ লেখা আমার জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার হয়ে উঠতো।এই মহান শিক্ষাগুরুকে তাঁর সহযোগীতার জন্য আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এর পরে মনে পড়ছে আমার জন্মদাতা পিতা সৈয়দ আলী আমজাদ হোসেনের কথা, গবেষণার কর্মটি সমাপ্ত করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তিনি আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সেই পিতাকেও জানাচ্ছি হাজারো সালাম। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, তিনি আমার গর্ভধারিণী মা সুরাইয়া বেগম; তার কথাও শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি তিনি আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে গবেষণা কর্মটি শেষ করার অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন, বিশেষ করে মাঠ পর্যয়ে কাজ করার সময় আমার সাথে ছিলেন সার্বক্ষনিক; সে মাকেও জানাচ্ছি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সালাম।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যারা আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী ও সাময়িকী সরবরাহ করে সহযোগীতা করেছেন। আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে যে সকল পল্লী নারী পুরুষ শিক্ষক শিক্ষিকা স্বত:স্ফুর্ত সাক্ষাৎকারদানে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগীতা প্রদান করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমার সকল শুভাকাংখী যারা গবেষণার কাজে সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় মা ও বাবা কে

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম মৌলিক শর্ত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সুষম মানবিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। এই মানব পুঁজির সৃজনশীল বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে গতি সঞ্চার করে। ইউনেস্কোর সংজ্ঞায় সাক্ষরতা বলতে বোঝানো হয়েছে, বুঝে পড়তে পারা, সহজ ও সাধারণ হিসাব-নিকাশ করতে পারা, পঠিত বিষয় অন্যকে বোঝাতে পারা, সর্বোপরি অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগাতে পারা। সাক্ষরতা ও শিক্ষা মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করে। শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের শ্লোগান Literacy and Empowerment. সম্প্রতি Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, কোনো দেশের সাক্ষরতার হার শতকরা এক ভাগ বাড়লে জাতীয় উৎপাদন শতকরা ২.৫ ভাগ বাড়ে এবং জিডিপি বাড়ে শতকরা ১.৫ ভাগ। কিন্তু আমরা জানি বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি শিশু এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ কন্যাশিশু।

বাংলাদেশের শিক্ষার বর্তমান অবস্থার চিত্র যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখা যায় নারী ও পুরুষ সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৫২.৭ শতাংশ ও ৫৯.৪ শতাংশ। অর্থাৎ নারী জনসংখ্যার অর্ধেক এবং পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত শহর অঞ্চলে এই সাক্ষরতার হার ৬৪.৫ শতাংশ নারী ও ৭১.১ শতাংশ পুরুষ, গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে ৪৮.৭ শতাংশ নারী ও ৫৫.৫ শতাংশ পুরুষ (2007 Gender Statistics of Bangladesh)।

বর্তমানে দেশে নানা ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। একদিকে সরকারি পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্যদিকে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা রয়েছে। সেখানে পাঠ্যসূচী দেশের বাস্তবতার আলোকে প্রণীত হয় না, ব্যয়ভারও বিপুল। আরো রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষা আবার দুই ধরনের। সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা এবং কওমী মাদ্রাসা। আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার কোনো আধুনিকায়ন হয়

Dhaka University Institutional Repository

নাই। ফলে এই শিক্ষা দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে মাদ্রাসা পাঠরত ছাত্ররা দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারার সাথে যুক্ত না হয়ে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। উচ্চবিত্ত পরিবার ছাড়া সাধারণের পক্ষে এ শিক্ষার সুযোগ নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষা অধিকার না হয়ে, হয়ে উঠছে পণ্য। মধ্যবিত্তের জন্য সাধারণ শিক্ষা, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা এবং উচ্চবিত্তরা লাভ করবে বিদেশ যাবার উপযোগী শিক্ষা। সমাজে এই বহুধা বিভক্ত শিক্ষা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমভাবে গড়ে না ওঠা ও সমব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করে। এই বৈষম্য প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে যেমন বিরাজমান, তেমনই একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানই মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না। যার ফলে আমারা দেখি ২০০৯-এর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭২টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজনও উত্তীর্ণ হয় নাই, অর্থাৎ ১০০ শতাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নয়টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো কমিশনের সুপারিশ বা কোনো নীতিই পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয় নাই। বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০০৯-এর ৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। যে কমিটি ড. কুদরত-ই-খুদা (১৯৭৪) ও শামসুল হক (১৯৯৭) শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর আলোকে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে।

আমরা জানি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল নাগরিককে শিক্ষার আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বর্তমানে দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। বর্তমানে দেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। এই শিক্ষানীতিতে সবকটি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য নিয়ে এসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিছু বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েচে। এসব বিষয় হলো: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করা যাবে। প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরে 'বাংলাদেশ পরিচিতি' বা 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' নামে নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে।

এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ এতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'মাধ্যমিক শিক্ষা' এবং এর পরের স্তরকে 'উচ্চ শিক্ষা স্তর' হিসেবে চালু করার সুপারিশ রয়েছে।

শিক্ষানীতিতে আগামী ২০১১-১২ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে শতভাগ ভর্তি এবং ২০১৮ সালের মধ্যে যেন সব শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণী শেষ করতে পারে সেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক:শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

খসড়া শিক্ষানীতির ভূমিকায় বলা হয়েছে "একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি সুষম, সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য চাই সার্বজনীন শিক্ষার গভীর ও ব্যাপক আয়োজন। প্রথিবীর উন্নয়ন-অগ্রগতি প্রগতির ইতিহাস ব্যাপক গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোনো জাতি, দেশ, রাষ্ট্র সামনে এগোয়নি, এগুতে পারেনি। এই ধ্রুব সত্য বিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার উষালগ্নে নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সবার জন্য একটি সুষম গণতান্ত্রিক উপযুক্ত মান-সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ ও বিকাশের সাংবিধানিক (ধারা-১৭) অঙ্গীকার নির্ধারণ করা হয়। সেই সাথে প্রসারিত মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষার শক্ত ভিত্তির উপর শিক্ষার অন্যান্য স্তরগুলোর উপরিকাঠামো তৈরির কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ন।

আরো বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

২৮টি অধ্যায়ে বিস্তৃত শিক্ষানীতির প্রথম অধ্যায় হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষানীতির দর্শন। এখানে বলা হয়েছে, সংবিধান, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বিবেচনায় নিয়ে মানবতার বিকাশ মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলার কথা। এক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্চনীয়, যা সুনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য ও কৌশলে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানীতির ভূমিকায় বিশ্ববাস্তবতা ব্যাখ্যাকালে বলা হয়েছে, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিকশিত তথ্য প্রযুক্তির এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নত শিরে এগিয়ে যেতে হলে শিক্ষা ও দক্ষতায় বলীয়ান, শক্ত মেরুদণ্ডের অধিকারী হতে হবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মেরুদণ্ড সোজা করে টিকে থাকা নয়, শিক্ষানীতির কর্ম-কৌশলে থাকতে হবে দিক-নির্দেশনা- দেশকে আমরা কোথায় নিতে চাই। এই উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়ে নিজস্ব মেধা, মনন আর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে দেশকে একটি পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টায় হওয়া উচিত শিক্ষা নীতির দর্শন।

নারী শিক্ষা বিষয়ক একটি ভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। সেই অধ্যায়টির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সমাজের ও দেশের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন। কেবল নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নয়। মনে রাখা দরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্য নয়, উন্নয়নের বাহক। নারী শিক্ষা, শিক্ষার মূলধারার বাইরের বিষয় নয়। শিক্ষার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনগত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে প্রয়োজন সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে নারীর অধস্তণ অবস্থার পরিবর্তন, সমঅধিকার অর্জন এবং নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীকে বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ীভাবে গড়ে তোলা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যৌতুকবিরোধী, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নারী নয়, নারী ও পুরষ উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। সমাজে, রাষ্ট্রে ও পরিবারে জেন্ডার সমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারী শিক্ষার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার প্রায় সমান। বরঞ্চ ছাত্রী ভর্তির হার বেশি। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক ও পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং ছাত্রীদের ঝরে পড়ার বিষয়টি পৃথকভাবে বিবেচনা করে কর্মসূচী ও কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। ঝরে পড়া ছাত্রীদের শিক্ষা মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক কর্মসূচী যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও যাতায়াত সমস্যাসহ ছাত্রীদের ঝরে পড়ার কারণগুলো চিহ্নিত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রতি একটি গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয় ৬ শতাংশ ছাত্রী ঝরে পড়ে ইভটিজিং-এর কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে বিদ্যামান পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। পারিবারিক সহিংসতাসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নারীর প্রতি অধস্তণ দৃষ্টিভঙ্গি।

নারীর প্রতি মর্যদাপূর্ণ এবং জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য প্রথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সকল পাঠ্যসূচী জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। নারীর ইতিবাচক ও যথার্থ ভাবমূর্তি নির্মাণের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য ও উদাহরণ যেন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হয় সেদিক সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে অধিক সংখ্যক মহিয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা হতে হবে ধর্ম, জাতি ও শ্রেণী নিরপেক্ষ। জেন্ডার স্টাডিজ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সকল স্তরের পাঠ্যসূচীতে পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

জেন্ডার সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেবলমাত্র পাঠ্যক্রমে নজর দিলে চলবে না, শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমকেও গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে জেন্ডার স্টাডিজ যুক্ত করতে হবে। কেননা নারীর প্রতি যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। অনেক সময় শিক্ষকরা ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত না করে, সংসার পালনে উৎসাহিত করে থাকেন, বা ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রনোদনা যোগান না। শিক্ষকদের জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে জেন্ডার স্টাডিজ যুক্ত করা প্রয়োজন।

একটি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে সুপরিকল্পিত আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন যে শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে সকলের সমান অধিকার। নারীর ক্ষমতায়ন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রগতি একে অপরের পরিপূরক। ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে একজন নাগরিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নাগরিক অধিকার প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নারী শিক্ষার বিষয়টি দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। একটি হচ্ছে নারীর শিক্ষার অধিকার। অর্থাৎ শিক্ষার সকল পর্যায় ও ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অপরটি নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাকে বাহন করা। নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আধুনিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তেলার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও পাঠ্যক্রমকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা। বর্তমান সময়ে শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে নারীর অধিকার যুক্ত করে দেখা জরুরি হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ জীবনযাত্রায় সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রামীণ পরিবারগুলো ভূমি, শ্রম, পুঁজি, জ্ঞান এবং বাজারের উপর ভিত্তি করে তাদের জীবিকা পরিচালনা করে যেগুলো পরিবারের সমৃদ্ধি এবং সম্পদের টেকসই ব্যবহার ত্বরান্বিত করে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু আছে। এই ধারায়/ব্যবস্থায়, পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিচালনায় পুরুষরা সর্বময় ক্ষমতা উপভোগ করে যেখানে নারীদের কাজের ক্ষেত্র/ধরণ কিছুটা নিম্ন স্তরের। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক, আইনগত, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বঞ্চনা নারীদের অবস্থানকে খারাপতর করেছে এবং তাদেরকে সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। আত্মীয়তা অথবা বিবাহের মাধ্যমে নারীরা উৎপাদনক্ষম সম্পদে পুরুষের সাথে যুক্ত হয়। এছাড়াও, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের চাহিদা এবং প্রয়োজনগুলো প্রায়ই অবহেলা করে। ব্যাডেন পরিবারের মধ্যে কিছু লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন যেগুলোর মধ্যে রয়েছে উৎপাদনক্ষম সম্পদে অংশগ্রহণ, পরিবারের শ্রমশীল কাজে কর্তৃত্ব, শ্রমবিভাজনে দৃঢ়তা প্রদর্শন এবং গৃহস্থালী ব্যয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্ব।

বাংলাদেশে মোট ১৪৯.৭ মিলিয়ন লোকের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ৭৪.৪ মিলিয়ন (পিআরবি, ২০০৫)। অধিকাংশ লোকই দরিদ্র ঝুকিগ্রস্থ এবং প্রান্তিক, তাদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। তারা বীজ উৎপাদন, পশুপাখি পালন, মৎস্য চাষ, ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, জীব বৈচিত্র্যের রক্ষনাবেক্ষন, শক্তি ও পরিবারের ব্যবস্থাপনা । খাদ্য উৎপাদন এবং পরিবারের কল্যাণে তাদের ভীষণ অবদান সত্বেও পল্লী নারীদের অবমূল্যায়ন করা হয় এবং উন্নয়ন স্ট্রেটেজিতে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সংস্কৃতিক এবং আনুষ্ঠানিক এবং বিস্তৃতি সেবাসমূহে তাদের প্রবেশাধিকারকে প্রভাবিত করা ।

এটা প্রশংসনীয় ব্যাপার যে, বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সাল থেকে নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়ন করেছে। নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য এনজিও-দের বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন উন্নয়ন এজেন্সীগুলো শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন, ঋণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সচেতনতা, মানবাধিকার ও শোষণ বিষয়ক কিছু পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার পার্থক্য হ্রাস করার জন্য কিছু উদ্দীপনামূলক পদক্ষেপ যেমন বিশেষ বৃত্তিসহ বালিকাদের জন্য বিনাবেতনে শিক্ষা, স্থানীয় সরকারে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা ব্যবস্থা এবং আইন সংশোধনী করা হয়েছে। যাই হোক, নারীর সম্পত্তির অধিকার বাংলাদেশে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করেছে যেহেতু এটি ধর্মীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। মুসলিম আইনে, একজন কন্যা তার ভাইয়ের অংশের একের অর্ধেক পায়, স্ত্রী পায় তার মৃত স্বামীর ১/৮ ভাগ । ভূমি মালিকানা না থাকার কারণে নারীদেরকে অনেক উন্নয়ন এজেন্সী কম মনোযোগ দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশ কৃষি প্রসারণ সরবরাহ সেবা সমূহ এখনও পুরুষ কৃষকদের দিকে দেওয়া হয়। এর ফলে অধিকাংশ নারীই আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সম্পত্তির অধিকার নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উপাদান এবং সহস্রাব্দ উন্নয়নের একটি ভিতও বলা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার এবং নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার নিশ্চিত করতে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘ নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে এমডিজি-৩ বিষয়ে ৭টি আন্তনির্ভরশীল স্ট্রেটেজিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। দুটো স্ট্রেটেজি হলো নারীর সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা দূর করা ।

একটি রাষ্ট্রের উন্নযনের অন্যতম হাতিয়ার সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। কোনো রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনসংখ্যা যদি অশিক্ষিত হয় তবে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে না। আর দক্ষ মানব সম্পদের অভাব রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যাহত করবে। পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রের পুরুষের শিক্ষার হারের তুলনায় নারীর শিক্ষার হার কম হলে সেই রাষ্ট্র উন্নয়নের ধারা থেকে বঞ্চিত হবে।

শিক্ষিত মানবভিত্তি ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে শিক্ষার হার কম। আর নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর শিক্ষার পথে তীব্র বাধা সৃষ্টি করেছে।

অনেক মেয়ে উচ্চশিক্ষিত হওয়া তো দূরে থাক প্রাইমারী শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না। আবার প্রাইমারী শিক্ষা সম্পন্ন করলেও মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে ঝরে পড়ছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। যেহেতু নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাই অধিকাংশ নারী যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দক্ষ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। তাদের দারিদ্র্যসহ অন্যান্য নানা সমস্যায় আক্রান্ত হবার

Dhaka University Institutional Repository

কারণ জীবনযাপন সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান যা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণত বৃদ্ধি পায় তা থেকে নারীরা বঞ্চিত হওয়ায় এ ঝুঁকিগুলো আরো বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই একটি মেয়ে শিক্ষিত হওয়ার অর্থ হলো তার নানাবিধ সুরক্ষা।

বেশ কয়েক দশক আগেও নারী শিক্ষার অগ্রগতি মোটেও হয়নি। সেসময় শিক্ষিকা, ডাক্তার বা সেবিকা ছাড়া নারীরা অন্য পেশা গ্রহণ করবে এমন কথা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কখনো কল্পনাও করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। নারী শিক্ষার বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে নারীরা শিক্ষিকা, ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি অনেক চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসছে। কিন্তু এর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। আর একক কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দেখার জন্য গ্রামদুটিতে দুটি স্কুল নির্ধারণ করা হয়। সমীক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণসহ শিক্ষক, শিক্ষিকা, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে আলোচনা ও পরিবারের তিন প্রজন্মের সাক্ষাৎকার। আর এই সমীক্ষাটি ক্ষুদ্র হলেও এর মধ্যে উঠেছে সারা বাংলাদেশের বাস্তবতা।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে একটি নব্য স্বধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ভৌগলিক,রাজনৈতিক ও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে,নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থার বিশেষ উল্লেখ করে।এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারী শিক্ষার এক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।গবেষণার উদ্দেশ্য,গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে পাক ভারত উপমহাদেশের কিছু বরেণ্য ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করা হয়েছে।এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার দত্ত,ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর,রাধা কান্ত দেব,বেগম রোকেয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।কেননা তদানীন্তন সময়ে অভিজাত পরিবারের কোন মেয়ে বিদ্যালয়ে যেত না ।যেসকল মেয়ে সমাজের নিম্ন স্তর থেকে এসেছিল তারাই কেবল বিদ্যালযে যেতেন।শিক্ষাক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার আবরণ উন্মোচনে এদের বিশেষ অবদান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার সাম্প্রতিক চিত্র ও নারী শিক্ষার উদ্ভব সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ।মাধ্যমিক লেভেলে ছাত্র ছাত্রী ঝড়ে পড়ার হারে দেখা যায় যে,পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশী ।এখানে নারী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।বেইজিং কনফারেন্স ও এর পরবর্তী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে ।জাতীয় শিক্ষানীতি ও নারী শিক্ষা এবংএর কার্যক্রমকে জেন্ডার দৃষ্টি কোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে ।নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও তাদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি যেমন রাজনৈতিক সচেতনতা,সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বিয়ের বয়স বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।সর্বোপরি পল্লী নারী জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে যেসব শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রচলিত আছে তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে, এর পরে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর শিক্ষা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনা প্রদানের পর অনুরুপভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কেও একটি দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করত গিয়ে ব্র্যাক এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের সরকারী বেসরকারী ভাবে গৃহীত পল্লী নীতিমালা বিষেয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে ১৯৫৩ সালে গৃহীত কর্মসূচী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত গৃহীত কর্মসূচীর এক পর্যলোচনা করা হয়েছে। এখানো আলোচ্য কর্মসূচী গুলোর মধ্যে রয়েছে সোসাল সেফটিনেট কর্মসূচী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী, অসচ্ছল মুক্তেযুদ্ধাদের জন্য কর্মসূচী, নারীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহযোগীতা কর্মসূচী খাদ্য সহায়তা কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচনের বিশেষ কর্মসূচী আলোচনা করা হয়েছে। এসব কর্মসূচীর ফলে কি কি পরিবর্তন সার্ধিত হয়েছে তারও এক উল্লেখ যোগ্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচ্য গ্রাম দুটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গাজীপুর জেলার দুটো গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ে সার্বিক আলোচনার এক সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র পৃষ্ঠা নং

প্রত্যয়নপত্র II

ঘোষণাপত্র III

গবেষকের কথা IV

উৎসর্গ V

সার-সংক্ষেপ VI

বাংলাদেশের মানচিত্র

গাজীপুর জেলার মানচিত্র

প্রথম অধ্যায়-নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাধারন আলোচনা ১-১১

১.১. ভূমিকা
১.২ গবেষনার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব
১.৩ নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন
১.৪ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারী শিক্ষা
১.৫পল্লী উন্নয়নের অর্থ ও প্রত্যয়সমূহ
১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ
১.৭ গবেষণা পদ্ধতি
১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায়- শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন,নারী শিক্ষা ও নারী শিক্ষা বিষয়ক তাত্ত্বিক ধারণা ১২-২৭

২.১ পল্লী উন্নয়ন
২.২ পল্লী উন্নয়নে নারী
২.৩ নারীশিক্ষার প্রসার
২.৪ বাংলার মুসলিম নারী
২.৫ নারীশিক্ষার উন্নতি সাধন
২.৬ মুসলিম নারীশিক্ষার দিশারীগণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়- নারী শিক্ষা ,জেন্ডার সচেতনতা ও আত্ম উন্নয়ন ২৮-৪১

৩.১ বাংলাদেশে নারী শিক্ষার অবস্থা

৩.২ নারী শিক্ষার উদ্ভব

৩.৩ উচ্চ শিক্ষায় নারী

৩.৪ নারী শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ

৩.৫ বেইজিং কনফারেন্স ও এর পরবর্তী ঘটনাসমূহ

৩.৬ জাতীয় শিক্ষা নীতি ও নারী শিক্ষা

৩.৭ নীতিমালার কার্যসমূহ: জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষার স্ট্রেটেজিসমূহ

৩.৮ পল্লী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৩.৯ পল্লী নারীর সামাজিক মর্যাদা

৩.১০ পল্লী নারীদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতার বিস্তৃতি

৩.১১ বাংলাদেশের পল্লী নারী জেন্ডার সচেতনতা

৩.১২ জেন্ডার সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

৩.১৩ পল্লী নারীর মর্যাদা

চতুর্থ অধ্যায়- বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৪২-৭৩

৪.১ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

৪.২প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

৪.৩প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো

৪.৪ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

৪.৫ প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৮৩

৪.৬ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনঃ১৯৯০

৪.৭ প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন

৪.৮ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features)

৪.৯ কিভাবে FFEP-এর সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হয়

৪.১০ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.১১ মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো

৪.১২ মাধ্যমিক শিক্ষায় উন্নয়ন ও উদ্ভাবন

Dhaka University Institutional Repository

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

খ) ফিমেলসেকেন্ডারী স্কুল এসিট্যান্স প্রজেক্ট

গ) মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রকল্প

ঘ) নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প ও নোরাড পরিচালিত নির্ধারিত ৭টি থানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প

ঙ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন

চ) ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট

পঞ্চম অধ্যায়-বাংলাদেশে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী

পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ৭৪-৮৫

৫.১পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা
৫.২ প্রধান প্রধান পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী
৫.৩ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল্যায়ন
৫.৪ সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামস
৫.৫ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী
৫.৬ বিধবা ,ডিজার্টেড ও হতভাগা নারীদের জন্য কর্মসূচী
৫.৭ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসূচী:
৫.৮ এসিড দগ্ধ নারী ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং পুনর্বাসন
৫.৯ নারীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতা কর্মসূচী
৫.১০ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচী
৫.১১ দারিদ্র বিমোচনের বিশেষ কর্মসূচীসমূহ
৫.১২ দারিদ্র হ্রাসের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীসমূহ
৫.১৩ ক্ষুদ্র ঋণের প্রধান প্রধান এনজিও ও বিশেষায়িত সংগঠনগুলোর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ
৫.১৪ গ্রামীণ ব্যাংক
৫.১৫ ব্র্যাক
৫.১৬ আশা
৫.১৭ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF
৫.১৮ পল্লী উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয় ও স্ট্রেটিজেসমূহ
৫.১৯ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

৫.২০ সাক্ষরতা হারের পরিবর্তন

৫.২১ বিদ্যালয়ে প্রকৃত ভর্তির হারে পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়-আলোচ্য গ্রাম দুটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যাবস্থা নারী শিক্ষার অবস্থা ও পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

৬.১ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা **৮৬-৯৯**

৬.২ সামাজিক অবস্থানের নির্ধরকসমূহ

৬.৩ কী কী বৈশিষ্ট্য নারীদের সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করে?

৬.৪ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

৬.৫ পল্লী নারীদের প্রোফাইল

৬.৬ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
কেস স্টাডি

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা **১০০-১০৪**

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থপঞ্জী- ১০৫-১০৭
পরিশিষ্ট-২
প্রশ্নমালা- ১০৮-১০৯

Dhaka University Institutional Repository

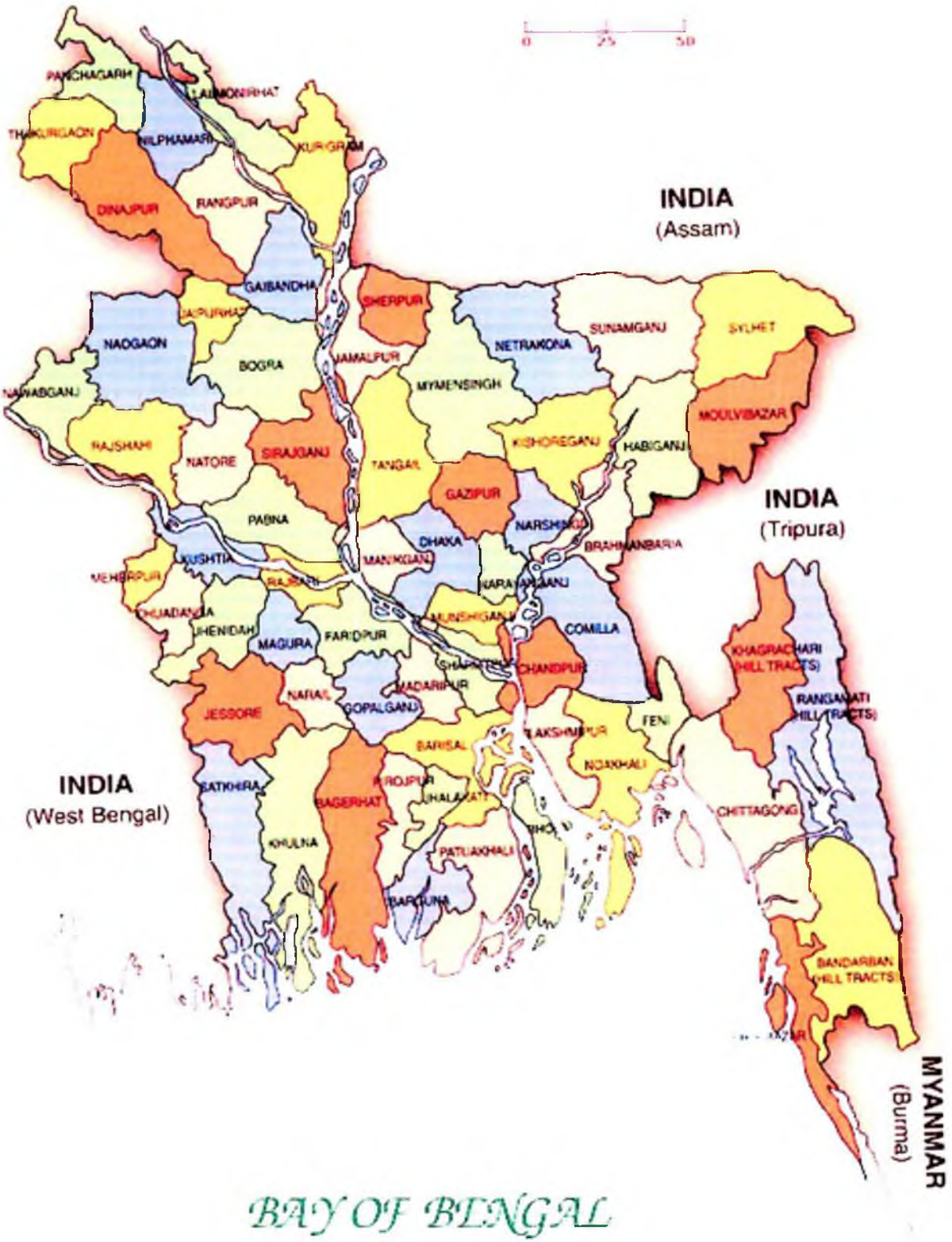

বাংলাদেশের মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

গাজীপুর জেলার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়:নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা

১.১ ভূমিকা

সুজলা-সুফলা, শষ্য শ্যামলা আমাদের এ বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপুর্ব লীলাভূমি এদেশকে যেন বিধাতা সমস্ত সৌন্দর্য উজার করে দিয়েছেন। ফুলে-ফলে, শষ্যে ভরা এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব।

বাংলাদেশ গ্রামবহুল দেশ-এর এক একটা গ্রাম যেন প্রকৃতির এক লীলা নিকেতন। যে দিকেই তাকাই না কেন, দেখা যায় সবুজ মাঠ, ফল-ফুলময় বৃক্ষ-তৃণ বনানীল শোভা আর শস্য-শ্যামল ক্ষেত। এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে কে না মুগ্ধ হয়? কোথাও প্রকৃতির সবুজ অঞ্চলের মধ্য হতে পক্ক শস্যেও সুন্দর মুখখানি বের হচ্ছে, কোথাও দীর্ঘ বটবৃক্ষ, মৌন প্রান্তরের মাঝে উর্ধ্ববাহু বাড়িয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে সুশীতল ছায়া দিয়ে পথিকের প্রাণ শীতল করছে। কুটির ঘেরা পল্লী গ্রাম, মাঠ সবুজের সমারোহ, দীঘির কালো জলে কলরত শুভ্র হংস-হংসী সাঁতার কাটছে। সারি সারি তাল, নারকেল বৃক্ষ তার প্রতি প্রতিনিয়ত আকর্ষণ সৃষ্টি করছে।

আর এ অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের দুটি গ্রামে নারী শিক্ষার অবস্থা ও পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা আলোচনা করব। কারণ আমাদের গ্রামগুলোতে নারী শিক্ষার অবস্থা তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি। তবে আমি যে গ্রাম দুটি নিয়ে আলোচনা করব তার শিক্ষার অবস্থা মোটামুটি ভাল।

১৯৭১ সালে একটি নব্য স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভব । ব্যাপক জনসংখ্যা, নিম্ন মাথাপিছু আয়, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, শিশুশ্রম, অপুষ্টি, দুর্নীতি ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যায় দেশটি জর্জরিত। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব সংকটজনক এবং গ্রামীণ কৃষিখাতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রতিবছর বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মাথাপিছু আয়, ভোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা ও শারীরিক অবকাঠামোর দিক থেকে পল্লী ও নগরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ও বেশ কিছু এনজিও বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র লোকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি আদর্শের উপর ভিত্তি করে নতুন সমাজ গড়ার আশা আকাংখ্যায় বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে। নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরে সবচেয়ে জরুরী ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। এরই সূত্র ধরে একটি দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ।কমিশন ১৯৭৪ সালে এবিষয়ে রিপোর্ট তৈরি করে। এখানে শিক্ষার সব দিক তুলে ধরা হয় এবং সুদূর প্রসারি সুপারিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে কমিশনের রিপোর্টটি গ্রহণ করার মতো আনুষ্ঠানিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তৎপরবর্তীতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণগঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরি করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের অ্যাডভাইজার শিক্ষা কাউন্সিল ১৯৮৩ সালের শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। যাইহোক এই সব কমিশন কোন সরকারের অনুমোদন লাভ করেনি।বাংলাদেশের আলোকে যেসব তথ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা ১৯৭৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, এসব পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা নীতি পরিকল্পনা ও কর্মসূচী তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়নেরও স্ট্রেটেজি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ১ বছরের মধ্যে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই সংবিধানে শিক্ষা নীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ জারির পর রাষ্ট্র ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের রূপ পরিগ্রহ করে। তখন থেকে এই সংবিধান সংস্কার দেশের শিক্ষানীতির আদর্শগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদের ১৭নং ধারাটি শিক্ষা নীতির বৃহত্তর ভিত্তি, এখানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসাবে সরকারের সাংবিধানিক বলে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং এখানে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের উচিত সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রণয়ন করা।

১.২ গবেষণার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

বাংলাদেশের মতো একটি দেশের উন্নয়নের জন্য বালিকাদেব শিক্ষাদান একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা একটি মানবাধিকার এবং সমতা অর্জন, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যমও বটে। বৈষম্যহীন শিক্ষা নারী পুরুষ উভয়ের মঙ্গল বয়ে আনে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। সমাজ পরিবর্তনের এক অপরিহার্য অংশ হতে হলে নারীদের অবশ্যই শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। বালিকাদের শিক্ষাদান মানেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত নারী অল্প সন্তান নেওয়া পছন্দ করে, নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়, শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠায় এবং তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়। তারা খুব সহজে চাকরি পায় এবং উচ্চ বেতন পায়। যেহেতু নারীরা পুরুষের তুলনায় শিশুদের লালন-পালনে বেশি যত্নশীল তাই তারা আয়ের টাকা তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয় করে। শিক্ষিত নারী নাগরিক কর্মকাণ্ডে অধিক মনোযোগী থাকে। এমনও দেখা যায় যে, একজন শিক্ষিত নারী অতি সহজে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে পরিবারকে রক্ষা করতে পারে। যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালিকাদের ভর্তির পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারনে সন্তোষজনক নয়। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ খুব প্রয়োজন।যাইহোক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে।কিন্তু ক্ষমতায়ন বলতে প্রকৃত পক্ষে কি বোঝানো হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। ক্ষমতায়ন শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক, কেবলমাত্র আয় বৃদ্ধি কিংবা বস্তুগত সম্পদের অধিকার বোঝায় না। নিরক্ষরতা থেকে জনগণকে মুক্ত করা, তাদেরকে যথাযথ জ্ঞান সরবরাহ কিংবা কিভাবে করতে হবে তা জানা, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো, পুষ্টিগত অবস্থা এবং প্রান্তিক সামগ্রিক অবস্থার অবসান, নিম্ন মর্যাদা ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে- এসবই ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলাদেশের পল্লী নারীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ঐতিহ্য, পূর্বসংস্কার, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের শেকলে বাঁধা। তাদের ক্ষমতায়ন বলতে জনগণের উন্নয়নের জন্য যেসব উপাদান প্রয়োজন তার সবকিছু বোঝায় ।এটা লক্ষনীয় বিষয় যে, নারীরা বাংলাদেশের পল্লী এলাকার শ্রম শক্তিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ যেখানে ৮৬,০০০ গ্রাম এবং যার জনসংখ্যা ১৩৭.৪ মিলিয়ন। বর্তমানে যেখানে পুরুষদের বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৫২ শতাংশ, সেখানে নারীদের হার ২৯ শতাংশ। এখানে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তার মধ্যে বালিকাদের নিম্ন ভর্তির হার অন্যতম।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৭ বছর মেয়াদী, এর মধ্যে ৩টা উপ-লেভেল আছে- জুনিয়র মাধ্যমিক শিক্ষা (গ্রেড vi-viii), মাধ্যমিক শিক্ষা (গ্রেড ix-x), এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। গ্রেড x শেষ করার পর ছাত্ররা পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (ssc) অর্জন করে। গ্রেড xii শেষ করার পর তারা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্জন করে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ বাংলাদেশে যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, নারীদেরকে সম্পদের চেয়ে দায়বদ্ধতা হিসাবেই বেশি দেখা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিনা বেতনে হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় টিউশন ফি লাগে। টিউশন ফিস ছাড়াও ছাত্র ও তার পরিবারকে অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ যেমন যানবাহন, অর্থ, ইউনিফর্ম, স্টেশনারী ও পরীক্ষার ফিস বহন করতে হয়।

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি স্তর রয়েছে- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা (গ্রেড v-xii) যার মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রেডকে নিম্ন মাধ্যমিক, গ্রেড ix-x কে মাধ্যমিক এবং গ্রেড xi-xii কে উচ্চ মাধ্যমিক। টারশিয়ারি শিক্ষার মধ্যে দুই বছরের ব্যাচেলর কোর্স আছে যার মধ্যে তিন বছর ও চার বছর মেয়াদী ব্যাচেলর কোর্স এবং এক বছর মেয়াদে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষার এক অনুরূপ ব্যবস্থা বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে এবং এটি মাদ্রাসা শিক্ষা নামে পরিচিত। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে কামিল, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শিক্ষা, আলাদা আলাদাভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের অনুরূপ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, মাদ্রাসা শিক্ষায় কিছুটা আধুনিকায়নের ছোঁয়া এসেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে অধিক প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে। প্রায় ৩ মিলিয়ন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত।

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার পর বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সবার জন্য ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১৮ মিলিয়ন। ৬৫ শতাংশেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ;বাকীগুলো রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী বিদ্যালয় সরকারী সহযোগিতায় পরিচালিত। বাংলাদেশ সরকার প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পুস্তক ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহ করছে । অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় যুক্ত আছে।

বাংলাদেশের এক জরীপে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে নারীদের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫টা প্রধান বাধা রয়েছে ,এ পাঁচটির চারটিই ব্যয়সংক্রান্ত ।জরীপকৃত পরিবারগুলোর ৪২ শতাংশই টিউশন ফিস

Dhaka University Institutional Repository

দুইজন অধ্যয়নরত বয়স্ক নারী

Dhaka University Institutional Repository

এর কথা বলেছেন এবং ২০ শতাংশ প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বইয়ের খরচের কথা উল্লেখ করেছে।

যাই হোক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বালিকাদের অনুপস্থিতির যেসব কারণ রয়েছে সেগুলো অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার চেয়ে অধিক জটিল। অধিকাংশ পরিবারই ছেলেদের জন্য তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের ৭০ শতাংশ ব্যয় করে। নারী শিক্ষাকে তারা কম মূল্যবান বলে মনে করে। বালিকাদের মনে করা হয় তারা বিয়ে করে ঘর সংসার করবে। তাদের পেছনে ব্যয় করাটা লাভজনক নয়। অতএব, তাদের জন্য মাত্র ২৭ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশে পল্লী এলাকায় সাক্ষরতার হার ৩৫ শতাংশ এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নারীদের মধ্যে ২২ শতাংশ (বিশ্বব্যাংক ১৯৯২)[১]। মাধ্যমিক শিক্ষা লেভেলে মোট ভর্তি ছাত্রদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ হলো নারী এবং তাদের ৫ শতাংশ গ্রেড x পর্যন্ত সম্পন্ন করেছে। এরূপ অফিসিয়াল পরিসংখ্যান ছাড়াও বিশ্বব্যাংক বেসিক স্কিল অর্জনের উপর পারিবারিক পর্যায়ে একটা জরীপ চালায়। এর ফলাফলে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার ১০ শতাংশ নূন্যতম সাক্ষরতা লাভ করছে এবং গণিতের জ্ঞান আছে। জরীপে আরোও দেখা যায় যে, এরূপ স্কিল অর্জনের মধ্যে জেন্ডার গ্যাপ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এরূপ পরিস্থিতিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১.৩ নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন

মোট জনসংখ্যার ৪৮.৬ শতাংশ হলো নারী (বি,বি,এস, ১৯৯৫)[২] পরিবারগুলোর ৯২ শতাংশ পরিবারই পুরুষ প্রধান এবং ৮ শতাংশ নারী প্রধান (ESCAP, ১৯৯৫)[৩]। ইসলাম হলো প্রধান ধর্ম। জনসংখ্যার ৮৮ ভাগ মুসলিম (EIU 1997) বাংলাদেশের লিঙ্গের অণুপাত এরূপ যে, ১০৬ জন পুরুষ এবং ১০০ জন নারী। নগর এলাকায় পুরুষ জনসংখ্যার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে।

শিক্ষা: বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষার হার গত ২৫ বছরের মধ্যে মাত্র ৩৪.৬ শতাংশ যা বিশ্বের সবচেয়ে নিম্ন হার। সাক্ষরতার হার নারীর জন্য ২৪.২ শতাংশ, পুরুষের তুলনায় কম। নারী শিক্ষার হার নগর এলাকার চেয়ে পল্লী এলাকায় কম। নগর এলাকায় নারীদের ৫২,৫ শতাংশ সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন পল্লী এলাকার ২০.২১ এর তুলনায়।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রম: বাংলাদেশে মোট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশ হলো ৩৯ শতাংশ যা নারীর নিম্নতর অংশগ্রহণ নির্দেশ কের। অধিকাংশ সময়, গবাদিপশুর ও পোল্ট্রি, সব্জি চাষ, ফসল কাটার পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষন, সাধারনত খামার বাড়ীগুলোতে করা হয়ে থাকে তা অ-অর্থনৈতিক বলে বিবেচনা করা হয।

পরিমার্জিত পদ্ধতিতে দেখা যায় যে, কর্মজীবি জনগণের প্রায় ৬৫ শতাংশ কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত। এই খাতে ৭১.৫ শতাংশ নারী ৬০.৩ শতাংশ পুরুষের তুলনায় কর্মে নিয়োজিত, যেসব নারী প্রাথমিকভাবে বিনাপারিশ্রমিকে পরিবারের কর্মী তাদের সংখ্যা কৃষিতে নিয়োজিত মোট কর্মসংস্থানের ৪৫.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় বৃহৎ কর্মসংস্থান ক্ষেত্র উৎপাদনশীল যেখানে ২১.৬ শতাংশ নারী নিয়োজিত। সব কর্মক্ষম লোকের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৬৪ শতাংশ। এই খাতে নারীরা খাদ্য বেভারেজ ও তামাক শিল্পের সাথে জড়িত (বি.বি.এস, ১৯৯৫, ESCAP)[৪]।

১.৪ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারী শিক্ষা

প্রায় ১ বিলিয়ন বয়স্ক নারী বিশ্বব্যাপী নিরক্ষর। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এই যে, বিশ্বের নিরক্ষর বয়স্ক শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হলো নারী। এই চিত্রের বেশীরভাগই লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বড় আলোচ্য বিষয়। প্রতিবছর ১৬ জন নারীর মধ্যে ১ জন নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বলিত নারীদের এই সংখ্যা প্রতি ১০০ জনে ১ জন। উপরোক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি সাধন করেছে।

যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম। এই জেন্ডার বৈষম্য দক্ষিণ এশিয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যতম কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত যেখানে জেন্ডার বৈষম্য খুব প্রকট।

সামগ্রিকভাবে এশিয়াতে শিক্ষার হার বেশী থাকলেও, ইস্ট এশিয়ার কয়েকটি দেশে শিক্ষায় মাত্রা অনেক বেশী। কয়েকটি ইস্ট এশিয়ান দেশে (ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া ও মালয়েশিয়া) নারীদের ভর্তির হার মধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে কিছু কিছু দেশ যেমন চীন, লাওস, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার রেকর্ড সন্তোষজনক নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ পল্লী উন্নয়নের অর্থ ও প্রত্যয়সমূহ

উন্নয়ন হলো একটি সাবজেকটিভ মূল্য নির্ভর প্রত্যয়। এখানে এটির অর্থের উপর কোন ঐক্যমত্য নেই, বিভিন্ন অর্থে এটি ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত উন্মোচন, প্রকাশ কিংবা উন্মুক্তকরণ বোঝায় যা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

১. মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি

২. আয়বণ্টন বৃদ্ধি

৩. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

৪. সম্পত্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ন্যায়বিচার।

এভাবে সংজ্ঞায়িত করার ফলে এই প্রত্যয়টিকে প্রায় সবপর্যায়ে ব্যবহার করা যায়- ব্যক্তি থেকে সম্প্রদায়, জাতি ও বিশ্ব সকল পর্যায়ে। সকল ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতি তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও স্থানকাল পাত্র ভেদে সবাই উন্নয়নেব আকাংখা করে ।

পল্লী উন্নয়ন শব্দটি পল্লী জনগণের জীবন যাত্রার মানের অগ্রগতির লক্ষ্যে পল্লী এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নকে বোঝায়। এ অর্থে এটি একটি সর্বাত্মক ও বহুমুখী প্রত্যয় এবং কৃষি, যৌথ কর্মকাণ্ড, গ্রাম ও কুটির শিল্প, বস্ত্রশিল্প, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সম্প্রদায়ের সেবাসমূহ ও সুযোগ সুবিধাসমূহ এবং সর্বোপরি পল্লী এলাকায় মানব সম্পদ উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে একটি প্রক্রিয়া, প্রসঙ্গ ও স্ট্রেটেজি-এর একটি বিষয় হিসাবে। প্রক্রিয়া হিসাবে এটি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতির কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে। প্রপঞ্চ হিসাবে, পল্লী উন্নয়ন হলো বিভিন্ন শারীরিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সমাজ সংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোর মধ্যে আন্তসম্পর্কের ফল হিসাবে। স্ট্রেটেজি হিসাবে এটিকে চিত্রায়িত করা হয় একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের অগ্রগতি হিসাবে, অর্থাৎ দারিদ্র ব্যক্তিদের উন্নয়ন। Discipline হিসাবে একটি বহুমুখী বিষয় কৃষি, সামাজিক, ব্যবহারিক, প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের অন্তভাগ প্রতিফলিত করে। রবার্ট চ্যাম্বার্সের ভাষায় (১৯৮১:৮৭)[৫]

"Rural developmetn is a strategy to enable a specific group of people, poor rural women and men, to gain for themselves and their children more of what they want and need. It involves helping the poorest among those who seek a livelihood in the rural areas to demand more of the

Dhaka University Institutional Repository

benefits of rural development. The group involves small scale farmes, tenants and the landless."

এভাবে পল্লী উন্নয়নকে উপরোল্লিখিত যেকোন অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিভিন্ন সংজ্ঞার জটিলতা বাদ দেওয়ার জন্য আমরা পল্লী উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করবো পল্লী জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র লোকদের জীবন যাত্রার মানের এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যা টেকসই উন্নয়ন ঘটাবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়াও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সচরাচর থাকবে জনপ্রিয় মনোভাবের পরিবর্তন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রথা ও বিশ্বাসসমূহ। সংক্ষেপে, পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়া পুরো পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তুলে ধরে যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থা একটি স্থবির জীবন থেকে গতিময় জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ট্রেনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যেকটি কোচ একটি আরেকটি সামনে ঠেলছে এবং পর্যায়ক্রমে পেছনটির ঠেলা খাচ্ছে। কিন্তু পুরো ট্রেনটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি শক্তিশালী ইঞ্জিনের প্রয়োজন হচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের গোপন সাফল্য লুকিয়ে থাকে ট্রেনের সাথে মানানসই একটি ভাল ইঞ্জিনের মধ্যে যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

পল্লী উন্নয়নের তিনটি মৌলিক উপাদান আছে-

১. **জীবনের মৌল চাহিদাসমূহ:** জনগণের কিছু মৌলিক চাহিদা আছে যা ছাড়া তাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। মৌলিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, মৌলিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং জীবনের নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি। যদি এর একটির অনুপস্থিতি ঘটে কিংবা সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় তখন আমরা বলতে পারি চরম অনুন্নয়নের অবস্থা বিরাজ করছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো যোগান দেওয়া, ব্যবস্থা করা সব অর্থনৈতিক প্রাথমিক দায়িত্ব কর্তব্যের আওতায় পড়ে ,তা সে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই হইক, সমাজতান্ত্রিক কিংবা মিশ্র অর্থনীতিই হউক। এই অর্থে আমরা দাবি করতে পারি যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পল্লী জনগণের জীবন যাত্রার মানের অগ্রগতির প্রয়োজনীয় অবস্থা যা হলো পল্লী উন্নয়ন।

২. **আত্মিক সম্মান:** প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতি কোন কোন ধরণের আত্ম-সম্মান, মর্যাদা কিংবা সম্মান খোজে। আত্ম-মর্যাদার অণুপস্থিতি ঘটলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বল্পতা বিরাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **স্বাধীনতা:** এই আলোকে স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক কিংবা আদর্শগত স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি বোঝানো হয়েছে। যতক্ষন পর্যন্ত সমাজ প্রকৃতির সাথে মানুষকে, অজ্ঞতা, অন্যান্য মানুষের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং গোড়া বিশ্বাসের সাথে বেধে রেখেছে ততক্ষন উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে বলে দাবি করা যায় না।

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ:

নিম্নের উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে এই গবেষণা কাজটি হাতে নেয়া হয়েছে যথা-

১. বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা।

২. প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের যে দুটো গ্রামের গবেষণা কর্ম পরিচালিত হবে তাদের অবস্থান, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ ও সমস্যাদি তুলে ধরা।

৩. প্রস্তাবিত গ্রাম দুটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী সমাজের অংশগ্রহণ, শিক্ষার হার, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু তারা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে তার একটি বিবরণ পেশ করা।

৪. শিক্ষার মাধ্যমে প্রস্তাবিত গ্রাম দুটোর নারী জনগোষ্ঠীর আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ণয় করা।

৫. নারী শিক্ষাই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতঃ আলোচ্য গ্রাম দুটোতে সেগুলোর কার্যকারিতা তুলে ধরা।

৬. আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা,বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করবো।

১.৭ গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অনুসরন করা হয়েছে

১. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

২.প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে। শহর ও নগর উভয় বিদ্যালয় থেকে জার্নাল,বই ও গবেষণাপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.প্রশ্নমালা-ক)সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রশ্নমালা, খ) মতামত জরীপ প্রশ্নমালা।

৪.ফোকাস গ্রুপ আলোচনাও করা হয়েছে।

৫.সাক্ষাৎকার গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা হলো একটি জটিল,নৈপুণ্যভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষ কাজ।প্রয়োজনীয় দক্ষতা,অভিজ্ঞতা,সহযোগীতা,সময়,অর্থ প্রভৃতি সম্বন্ধেই কেবলমাত্র একটি গবেষণা কাজ সম্পাদন করা যায়।এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য গবেষণা কাজটি সম্পাদনকালে আমাকে কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।তথ্য সংগ্রহ করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।গবেষণা কর্মটি পাঠ্যক্রমের আওতাভূক্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে গবেষণা কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্থ হয়েছে।পরিশেষে বলা যায়,উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ,পর্যবেক্ষন,কর্মপরিচালনা করা হয়েছে বিধায় গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করেনি বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১.বিশ্বব্যাংক,বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯২

২.বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টাটিসটিকস, বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯৫

৩.ESCAP. বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯৫

৪.প্রাগুক্ত,১৯৯৫

৫.চ্যাম্বার,রবার্ট,Rural development,1981

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন, নারী শিক্ষা ও নারী শিক্ষা বিষয়ক তাত্ত্বিক ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়- শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন,নারী শিক্ষা ও নারী শিক্ষা বিষয়ক তাত্ত্বিক ধারণা

২.১ পল্লী উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন শব্দটি উন্নয়ন শব্দের উপ সেট। উন্নয়ন হলো ব্যক্তি পরিবার সম্প্রদায় ও জাতির দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন। উন্নয়ন হলো এই অর্থে প্রাকৃতিক যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর সব ধরণের জীবনেরই বাচার ও উন্নতি করার একটি সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে। এই দুটো গুন বিবেচনা করে উন্নয়ন একটি বৈজ্ঞানিক গবেষনার দাবী রাখে। এখানে এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনেক পণ্ডিত এটি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উন্নয়ন নিয়ে এতো বেশী লেখালেখি হয়েছে যে, এ বিষয়ে আর কোন কিছু লিখতে যাওয়াটা কঠিন।

২.২ পল্লী উন্নয়নে নারী

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২৪.৩ মিলিয়ন; এর মধ্যে ৪৮.৬ শতাংশ নারী এবং ৫১.৪ শতাংশ পুরুষ। বাংলাদেশের গ্রামে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা মাত্র ১৯ শতাংশ। তারা অধিকাংশ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা জিনিষপত্র ধোঁয়া, গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী পালন, ফসল কাটার পরবর্তী কাজ, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু সময় পাল্টেছে। নারীরা এখন আর ঘরকন্নার কাজের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়, গৃহস্থ কর্মকান্ড ছাড়া পল্লী উন্নয়নে তারা ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সম্পূর্ণরুপে নির্ভর করে গ্রামের উন্নয়নের উপর। গ্রামে নারীর সংখ্যা অনেক কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে তাদের অবদানকে স্বীকার করা হয় না।

বাংলাদেশের মতো একটি দেশের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নতি সাধন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি খুব দুর্বল, ভূমি ও মানুষের অনুপাতের ব্যবধান অনেক বেশী। তাই জনসংখ্যা সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। টেকসই উন্নয়নের এই প্রত্যয়টি প্রথমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বিবেচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের সহযোগিতা করে। এটি এমন অবস্থা তৈরি করে যেখানে জনগণ উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে যাবে। তাই শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নয়ন এভাবে এরূপ উন্নয়নের অবস্থা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর নিয়ামক পদ্ধতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

১. বাংলাদেশের দরিদ্র নারী-পুরুষ অলস নয় আবার তারা অক্ষমও নয়। বাঁচার তাগিদে তাদের দৈনন্দিন সমস্যা মেটাতে তারা প্রচুর শক্তি ব্যয় করে। । শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এক্ষেত্রে উত্তমরুপে কাজ করতে তাদেব সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

২. বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সম্পদের কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। দারিদ্র হ্রাস না করে সামান্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ সহজ করে তুলতে গৃহস্থ সম্পদ সীমিত করে দেয়। শিক্ষা এবং ভোকেশনাল দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু এগুলো জাতীয় পর্যায়ে দুর্বল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অন্তসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে।

৩. সামগ্রিক প্রশ্ন হলো কিভাবে পল্লী এলাকায় মানব সম্পদকে প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

৪. দারিদ্র থেকে এতো লোককে বের করে আনা বেশ জটিল কাজ। এক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতার উন্নয়নের জন্য জনগণের পছন্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এ পরিস্থিতিতে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করবে।

অধিকার হলো একটি বিশেষ সম্পদের ব্যবহার, রক্ষনাবেক্ষণ কিংবা নিয়ন্ত্রন । সম্পদ হতে পারে অর্থনৈতিক (যেমন ভূমি ও ঋণ), রাজনৈতিক স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ এবং সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ) সামাজিক (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)। সাধারণত, নারী ও পুরুষ উভয়েরই তাদের উৎপাদনমূলক, পুনরুৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের অধিকারের জন্য বিভিন্ন লেভেলেব অধিকার প্রয়োজন । যখন সুবিধাবঞ্চিত নারীর বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বৃহত্তর অধিকার অর্জনে তাদের নিজস্ব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা থাকে তখন Muso Kotwane এই প্রক্রিয়াকে বলেন "ক্ষমতায়ন"।

অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীর উৎপাদনমূলক সম্পত্তিতে অধিকার খামার ব্যবস্থাপনা , আয় ও উৎপাদনের বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করে, দরকষাকষি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ায়, শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান বাড়ায়, আত্ম বিশ্বাস বাড়ায়, সামাজিক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করে এবং বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তা বিধান করে । পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচন নারীর উৎপাদনশীল সম্পত্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত । এভাবে পল্লী নারীদের মধ্যে সামাজিক পুঁজি নির্মাণের প্রচেষ্টাসমূহ টেকসই উৎপাদন এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন । উন্নয়নের সকল কর্মীই এক্ষেত্রে তাদেরকে সমর্থন করবে। একই সময়ে শোষণমূলক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক, ধর্মীয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত অণুশীলনসমূহের ফলাফল কারণ ও লক্ষন ঐতিহ্যগত জেন্ডার ভূমিকা এবং মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য জরুরী ।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার বিস্তার কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সব সময় সময়ের ক্রমানুসারে ঘটে নি। খৃস্টান মিশনারিরা এক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা উপনিবেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরিত করা। ছাত্রীরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছিল, কেননা কোন 'ভদ্রলোক' তাদের বাড়ির কোন বালিকাকে এই ধরনের স্কুলে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দেখা যায় কোম্পানির কর্মকর্তা এবং এ দেশে বসবাসকারী বৃটিশ নাগরিকবৃন্দ এবং তাদের পরিবারেব মধ্যে। তৃতীয় প্রবাহ দেখা যায় বাংলাদেশের শহরের উঠতি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে। শিক্ষা প্রসারে চতুর্থ এবং সবচাইতে শক্তিশালী প্রবাহ সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক সরকার স্বয়ং, যদিও এক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়।

এসময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্দাপ্রথার আবরণ যতো তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। ১৮৫০ সালে সংস্কারবাদীগণ উত্তরোত্তর অনুভব করেন যে, শিক্ষার পর্দাপ্রথা নারীকে তার মুক্তির পথ থেকে সরিয়ে রেখেছে (এই মুক্তি বলতে রক্ষনবাদী উদারপন্থী বা বিপ্লবীরা যাই বুঝুক না কেন)। প্রকৃতপক্ষে শত শত বছরের প্রথা বাংলাদেশের নারীকে এতই ভীত ও অসহায় করে রেখেছিল যে পর্দাপ্রথা বাতিল করে প্রগতিশীল যতো আইনই পাশ হোক না কেন, তাতে কিছু লাভ হবে না একথা তারা অনুভব করেছিল। কিন্তু মূল প্রশ্ন রয়ে গেল কিভাবে এবং কতোদূর পর্যন্ত পর্দাপ্রথা বলবৎ করা হবে।

যদিও নারীশিক্ষার উপর হিন্দুশাস্ত্রে কোন বাধা ছিল না, তবুও আঠারো এবং উনিশ শতকে এ শিক্ষাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলা করা হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তা নিষিদ্ধ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে যখন উইলিয়ম এ্যাডাম[১] তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন, তখন উল্লেখ করেন যে, বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে অমঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হতো কারণ জনগণ বিশ্বাস করতো যে এর ফলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মুসলিমরাও একই কুসংস্কারে ভুগছে।

ভদ্রলোক সংস্কারবাদীগণ প্রথমদিকে এই চিন্তা করেছিল যে, কিছু লেখাপড়া জাতির উপকারে আসবে (একইভাবে সমাজ উপকৃত হবে), তা ভাল জননী ও সঙ্গিনী পেতে সাহায্য করবে এবং তাতে সনাতন

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ অব্যাহত থাকবে। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে জি. বিদ্যালঙ্কার, দ্বারকানাথ ঠাকুর (এমনকি কট্টরপন্থী রাধাকান্তদেব), এ.কে. দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের মতো উদারপন্থী ভদ্রলোক সংস্কারবাদীদের মধ্যে এভাবে উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে প্রত্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুক্তি আন্দোলনেরব প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকজন বাদে মহিলারা নিজেরাই সহযোগী পুরুষদের সাথে একমত পোষণ করতো যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল বর পাওয়া এবং ভাল বধূ হওয়া। অবশ্য তৎকালীন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের নারীদের বেলায়ও এ বক্তব্য সত্য ছিল।

উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে আনুমানিক ১৮১৭ সালের দিকে বৃটিশ সরকার কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা শুধু পুরুষদের শিক্ষা দেবার কাজে লাগানো হয়। যাই হোক ১৮২০ সালে ডেভিড হেয়ার এবং কতিপয় স্থানীয় অধিবাসী মেয়েদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জে.ই.ডি. বেথুন কর্তৃক মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ছিল নারীশিক্ষার উন্নতির মাইলফলক। এর পরেও ভদ্রলোকেরা পর্দাপ্রথাকে অমান্য করে তাদের বাড়ির মেয়েদেরকে ঐ স্কুলে পাঠাবে কিনা এই ভেবে বেশ কিছু সময় নষ্ট করেন। বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভদ্রলোকদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তারা পর্দার বাধা অতিক্রম করতে পারবে? খুব কম লোকই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পেরেছিল।

যাই হোক, নারী শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং ১৮৬০ সালে বাঙালি ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারে যে, নারী শিক্ষা এবং নারী মুক্তি সমাজ সংস্কারেরই পথ এবং পর্দাপ্রথা এই পথে বিরাট বাধা। কালীপ্রসন্ন ঘোষ[২] এবং অক্ষয়কুমার দত্ত নারীর জন্য অবাধ শিক্ষা এবং স্বাধীনতার দাবিতে দ্ব্যর্থহীন ছিলেন। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত এ.কে.দত্তের ধর্মনীতি নারীমুক্তির সমস্যার উপর এক বিশদ তথ্য প্রদান করে। এতে বলা হয়:

> আগের যেকোন বাঙালি লেখকের চাইতে অনেক বেশি যুক্তি ও সমর্থন এসেছে ধর্মনীতির লেখকের কাছ থেকে। হিন্দু সমাজের সংস্কারের মূল সমস্যা দূরীকরণে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যথার্থতার যৌক্তিকতা দেখা যায়। বাঙালি পরিবারে সামাজিক অন্যায়সমূহ নিরীক্ষা করে অক্ষয়কুমার দেখতে পান যে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরে নারীর হীন ও দুঃখজনক অবস্থা থেকেই সেগুলোর সৃষ্টি। অতএব এখান থেকে সমাজ-সংস্কার শুরু হতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু হওয়া প্রয়োজন।[৩]

২.৩ নারীশিক্ষার প্রসার

নারীশিক্ষার প্রতি অক্ষয়কুমার দত্তের এই নির্ভীক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সব সংস্কারবাদী একমত ছিলেন না এবং বিদ্যাসাগর ও অন্য সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত নারী শিক্ষা খুবই সীমিত সফলতা অর্জন করে। রামকৃষ্ণ মুখার্জী বেথুন মডেল অনুসরণ করে সেই একই সালে (১৮৪৯) উত্তরপাড়ায় এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিশোরচন্দ্র মিত্র পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে রাজশাহীতে অনুরূপ এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন স্কুলের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সালে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুরে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ১৩০০ ছাত্রী এই স্কুলগুলিতে পড়তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নারীশিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতার জন্য এই স্কুলগুলি অর্থাভাবে অবশেষে বন্ধ হয়ে যায়। একজন বিশ্লেষকের মতে, বিদ্যাসাগরের স্থাপিত স্কুলসমূহ গ্রামীণ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোন সফলতা অর্জন করতে পারে নি, কেননা একদিকে অভিভাবকদের অনীহা ছিল, অপরদিকে স্কুলের সামান্য বেতন যোগাতেও তারা অপারগ ছিল (শরিফা,১৯৮৫)[৪]।

নারী শিক্ষার প্রতি ডালহৌসির অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী শিক্ষানীতিতে ভারতে নারীশিক্ষা প্রসারের অনুকূলে বিভিন্ন জোরালো পদক্ষেপের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ১৮৬০ সাল অবধি বিষয়টি খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ পরোক্ষভাবে এই প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কেননা সাধারণভাবে যেকোন সংস্কারের এবং বিশেষকরে নারীশিক্ষার দাবির ব্যাপারে সরকারি দায়িত্বগ্রহণের বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারকে খুবই সতর্ক করে দেয়।

১৮৭০ সালে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার সহযোগে তা সম্ভব হয়েছিল। বৃটিশ সরকার শিক্ষার দায়িত্বের বিরাট অংশ নবগঠিত পৌরসভাসমূহের নিকট হস্তান্তর করে। এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নারীশিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে এবং সেই সাথে গ্রামে 'স্ব-শাসিত' প্রতিষ্ঠানমূহের প্রচেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়ের বহুল প্রসার সম্ভব হয়। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ সালে মহিলারা সমকালীন বিভিন্ন সাময়িকী, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন।

এ সময় দুইজন যোগ্য এবং নিবেদিতপ্রাণ ইংরেজ মহিলা মিস মেরি কার্পেন্টার (১৮৬৬) এবং মিস এ্যানেট এ্যাক্রয়েড (১৮৭২)-এর উপস্থিতি দেখা যায়, যাঁরা বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন(Korf,16)[৫]। প্রগতিবাদী ব্রাহ্মরা এসব প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানায়। মিস এ্যাক্রয়েডের স্কুল ১৮৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় এবং মিস কার্পেন্টার ভারতে তৃতীয়বার এসে এই স্কুলকে ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়'- এ রূপান্তরিত করেন। দু'বছর পর এই প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুলের সাথে সম্মিলিত ভাবে ১৮৭৮ সালে বেথুন কলেজে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে মেরুকরণ প্রচ্ছন্নভাবেই শুরু হয়েছিল এবং ১৮৭০ সালের মধ্যে এ সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। সমস্যাটি তীক্ষ্ণভাবে দুটি ধারা বা দর তৈরি করে- একদল গার্হস্থ্য শান্তির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রবুদ্ধ স্ত্রী তৈরির ব্যবস্থা হিসেবে নারীশিক্ষাকে গণ্য করেছিল এবং অপরদলের দাবি ছিল, পুরুষের সমভিত্তিতে এবং সমপর্যায়ে নারী শিক্ষালাভ করবে। এরপর বেথুন কলেজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দাবি করা হয় যাতে মহিলারা বি.এ ডিগ্রি লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের মধ্যে এই ডিগ্রিধারী প্রথম মহিলারা ছিলেন কাদম্বিনী বসু (ব্রাহ্ম) এবং চন্দ্রমুখী বসু (খৃস্টান)।

এই সময়ে শিক্ষা আর কেবল মার্জিত রুচি ও মুক্তবুদ্ধি অর্জনের উপায় থাকলো না, বরঞ্চ তা কর্মসংস্থানের এক উপায় হিসেবেও দেখা দিল। ঢাকার মহিলা নর্মাল স্কুলের ছাত্রী এক বাঙালি বিধবা রাধামনি দেবী ভদ্রলোকশ্রেণী থেকে এ অঞ্চলের প্রথম মহিলাদের একজন, যিনি পেশাগত চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৬৬ সালে শেরপুরে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভাতে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। মহিলারা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং বেশ কিছু বাক-বিতণ্ডার পর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও প্রবেশাধিকার লাভ করে। ব্রাহ্ম প্রগতিবাদী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী কাদম্বিনী বসু (গাঙ্গুলী) ১৮৬৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ডাক্তার হন। বাঙালি নারীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির জন্য ১৮৮০ সাল এক উল্লেখযোগ্য দশক। এই দশকেই শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদেরকে উপযুক্ত বেতনে সরকারি চাকুরি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের বড় বড় শহর এলাকার (কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী) মহিলারা গণপ্রতিষ্ঠানসমূহে আরও অধিকহারে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। এঁরাই ছিলেন 'ভদ্রমহিলা'দের নতুন প্রজন্ম (মেরিডিথ,১৯৮৪)[৬]। এসব পেশাজীবী মহিলাদের মধ্যে বামা সুন্দরী দেবী, মনোরমা মজুমদার ও রাধারাণী লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত বিধবা মহিলার প্রচেষ্টাও বেশ উল্লেখ করা মতো। এঁদের মধ্যে ছিলেন মনমোহিনী হুইলার, পণ্ডিতা রমাবাঈ এবং স্বর্ণময়ী দেবী। রমাবাঈকে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট 'পণ্ডিতা' উপাধি প্রদান করে। "কামিবাজারের দয়াবতী মহিলা" স্বর্ণময়ী নারীশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশে অন্যতম শক্তিধর ও দয়াবতী জমিদার হিসেবে পরিচিত এবং পর্দার অন্তরাল থেকেই তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮২ সালে ভব্লিউ.ভব্লিউ, হান্টার যখন শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হন, তখনকার অবস্থা ১৮৩৫ সালে যা ছিল তা থেকে বেশ ভিন্ন। এই সময়ে বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১০১৫টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১১,৩৪৯। স্কুলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল বেসরকারি, তবে এগুলি সরকার থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভ করতো। ১৮৯৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বালিকা স্কুলের সংখ্যা ২০৯৪-এ পৌঁছায় এবং ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,০৭,৪০৩। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে এই সময়ে শিক্ষার্থীদের হার ছিল বালক ২৮.৯০% এবং

Dhaka University Institutional Repository

বালিকা ১.৯০%। তুলনা করলে বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়(শরিফা খাতুন,১৯৮৫)[৭]। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে বালিকাশিক্ষার ব্যাপারটা ততোখানি আশাব্যঞ্জক ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে এই হারের অবনতি ঘটে। ১৮৯৬-৯৭ সালে মেয়েদের জন্য মাত্র দুটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল- কলকাতায় বেথুন স্কুল এবং ঢাকার ইডেন স্কুল।

২.৪ বাংলার মুসলিম নারী

উল্লিখিত রিপোর্টে (হান্টার কমিশন, ১৮৮২) মুসলিম সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যজনক আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কথা বর্ণিত হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেশ কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত এক ব্যাপক জাগরণের সূত্রপাত করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিম নারীর শিক্ষা ও মুক্তির বিষয়টি খুব বেশি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে নি।

বাংলার মুসলিমদের বিষয়ে বলতে হয়, এই সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল এই কারণে যে, তাতে পর্দাপ্রথার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হবে। ১৮৬৭ সালে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সমিতির (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন) এক সভায় যখন জনাব আবদুল লতিফ একটা সমীক্ষা পড়ে শোনান, তখন প্যারীচাঁদ মিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হিন্দু নারীদের মতো মুসলিম নারীদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসারের একই ধরনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান আছে কিনা। এ প্রশ্নের জবাবে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আবদুল হাকিম বলেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো স্কুল-কলেজে মুসলিম নারীদের প্রেরণ করা অচিন্তনীয়। এই জবাবে কট্টর পর্দাপ্রথার পক্ষের শক্তির মত ব্যক্ত হয় এবং সেই সাথে এক কথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া মনোভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠে। মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রশ্নটি বেশ কিছু সময় পর্যন্ত আর তুলে ধরা হয়নি।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীই (১৮৪৭-১৯০৩) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মুসলিম নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং বিখ্যাত লোক-হিতৈষিণী মহিলা ছিলেন। তিনি কুমিল্লার পশ্চিম গাঁও-এর জমিদার ছিলেন। এ জমিদারির রাজস্ব আয় ছিল এক লাখ টাকা। লোকহিতকর কাজের জন্য রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নবাব' উপাধি প্রদান করেন এবং তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি নিজ গুণে এই উপাধি লাভ করেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, আরবি ও ফার্সি ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঢাকা থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম আখ্যানকাব্য *রূপজালাল*কে তাঁর নিজের ঝঞ্ঝাময় দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে গণ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। কিন্তু ফয়জুন্নেসার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সমকালীন এক বিখ্যাত ব্রাহ্ম কালিচরণ দে-র সহযোগিতায় ১৮৭৩ সালে কুমিল্লাতে ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই স্কুল পরবর্তীতে ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং এতে অনেক প্রতিভাধর ছাত্রী শিক্ষালাভ করে(বিশ্বকোষ,৩য় খন্ড)।[৮]

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়(মুনতাসীর,১৯৮৩)[৯]। পূর্ববাংলায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিস্তার, ছাপাখানার প্রসার, শহুরে সংস্কৃতির প্রচলন (যেমন নাট্যশালা) ইত্যাদির দ্বারাও এই সময়টি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে আছে। ১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাদের লক্ষ্য ছিল বহুবিধ জনকল্যাণমূলক কাজ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, সমাজসেবা প্রদান করা এবং শিক্ষার উন্নতির (বিশেষকরে নারীদের জন্য) লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নারীর শিক্ষা ও তার সার্বিক উন্নতির জন্য নিবেদিত হলো। নারীর দুর্দশা মোচন (বিশেষকরে শিক্ষার মাধ্যমে) এদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। পূর্ব বাংলার এমন ধরণের সমিতির মধ্যে ফরিদপুরের 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষাসভা' (১৮৭০) এবং 'কৌলিন্য সংশোধনী ও কন্যাবিক্রয় নিবারণী সভা' (১৮৭১), বগুড়ার 'কন্যাপণ নিবারণী সভা' (১৮৮৯) এবং ঢাকার 'বিধবা বিবাহসভা' (১৮৯৪) ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশর অন্যান্য শহরকেন্দ্রের পরিবর্তনের ধারার সাথে পূর্ববাংলার এই সময়ের সামাজিক পরিবর্তনের ধারার নিশ্চিত মিল থাকা সত্ত্বেও এর নিজস্ব এক বৈশিষ্ট্যও ছিল।

উপরে উল্লেখিত সমিতিসমূহের মধ্যে ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনি' মুসলিম নারীদের শিক্ষার বিষয়টাকে পুনরায় তুলে ধবতে প্রধান ভূমিকা রাখে। মুসলিম উদার ও প্রগতিশীলদের সৃষ্ট এই সমিতি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কাজে অগ্রসর হয়। এর অগ্রদূতদের মধ্যে ছিলেন নোয়াখালীর আবদুল আজিজ (তিনি তখনও ছাত্র), ফজলুল করিম, বজলুর রহিম, বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন এবং আবদুল মজিদ, হিম্মত আলি প্রমুখ। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার। এই উদ্দেশ্যে বাড়িতে শিক্ষাদানের এক অণুপম পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িতেই বালিকাদের জন্য পাঠ্যপুস্ত কাদি এবং পাঠ্যসূচী পৌঁছে দেয়া হতো এবং পরীক্ষাও তাদের বাড়িতেই গ্রহণ করা হতো। স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অপরিহার্য উপাদান ছিল ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যসূচী প্রবর্তন। উদার সমাজসংস্কারকেরা স্কুলের পাঠ্যসূচীর ধর্মনিরপেক্ষীকরণের প্রচারক ছিলেন। 'সম্মিলনী' এক সাড়াজাগানো আদর্শের কাজ করে যার ফলে উনিশ শতকের শেষ দু দশকে সীমিত হলেও মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার ভিত্তি সূচীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে অধ্যয়নরত বয়স্ক নারীবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষার্ধে বেশ কিছু মহিলা কবি এবং লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়, বিশেষ করে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়। এই শ্রেণীর মধ্যে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন সিলেটের মুসাম্মৎ সহিফা বানু (মুজির উদ্দীন,৪৫)[১০](আনু ১৮৫০-১৯২৬)। তিনি বিখ্যাত হাসনরাজার ভগিনী এবং সিলেটের আলি আমজাদ এস্টেটের ম্যানেজারের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ দশকগুলো রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের প্রারম্ভিক কর্মজীবনের সমকালীন। রোকেয়া সাখাওয়াৎ কলকাতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কিন্তু এই আন্দোলনের কোন প্রভাব যতদূর মনে হয় সুদূর সিলেটে বসবাসকারী সহিফার কাছে পৌঁছে নি। বাংলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় সহিফা লিখতেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর সাহিত্যকর্ম সমকালীন সমাজের ইসলামী ও হিন্দু সাংস্কৃতিক ধারার মিলন প্রতিফলিত করে।

রোকেয়ার বেশ কিছুকাল পূর্বে খুলনার আজিজন্নেছা লেখালেখি শুরু করেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)[৭] জীবনীকার আবুল আহসান চৌধুরী লেখেন : 'বেগম রোকেয়ার পূর্ববর্তী একজন ইংরেজী শিক্ষিতা মুসলিম লেখিকা হিসেবে তাঁর যে সম্মান, স্বীকৃতি ও মনোযোগ প্রত্যাশিত ছিল তা তিনি পাননি।' (আবুল আহসান চৌধুরী, ১৯৯৬,)[১১]। আনুমানিক ১৮৬৪ সালে আজিজন্নেছা ভারতের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মলি চাঁদ আলী পুলিশের দারোগা ছিলেন। আজিজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও অধ্যাপক মৌলবি মেযারাজউদ্দীনের গৃহশিক্ষায় ও যত্নে তিনি ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি রপ্ত করেন।

সংসারজীবনে তিনবার বিবাহ করেও আজিজন্নেছা বিধাবা হন এবং ভ্রাতৃগৃহে তাঁর বাকী জীবন কাটে। ১৯৪০ সালের কোন এক প্রত্যুষে তার মৃত্যু হয়। আজিজনের হারমিট বা উদসীন ১৮৮৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২ হলেও সেই যুগে সুদূর খুলনা নিবাসী এক বাঙালি মুসলিম মহিলার পক্ষে এই পুস্তক রচনা একটি কীর্তি বৈ কি। এছাড়া তিনি কোরবানী নামের এক অপ্রকাশিত কাব্য ছাড় পত্র-পত্রিকায় কিছু (৬টি) লিখে গেছেন। এর মধ্যে ইসলাম দর্শন ১৩৩০-এ প্রকাশিত হয়, স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রোকেয়ার কিছুকাল পূর্বে পথিকৃৎ নারীদের মধ্যে অপর একটি নাম খায়েরন্নেসা খাতুন। এই অসাধারণ মহিলার জীবনীকার সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন : 'খায়েরন্নেসা খাতুনের জন্মসন ও তারিখ শুদ্ধ নয়, তাঁর শৈশব-কৈশর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি; এমন কি তাঁর পিতা-মাতার নামও জানা যায় নি।' (আবুল মকসুদ, ১৯৯৮, পৃ.১৮)[১২]। এতটুকু জানা যায় যে তাঁর জন্ম ১৮৭৪-৭৬ এর মধ্যে, সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহরের "মুন্সিবাড়ী" নামক এক মধ্যবিত্ত পরিবারে"। (ঐ)। খায়রন্নেসা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্প বয়সেই এক বিদ্যানুরাগী সাবরেজিস্ট্রার

Dhaka University Institutional Repository

আসিরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খায়েরন্নেসা 'নবনূর'-এ 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' ও 'স্বদেশানুরাগী' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এছাড়া তিনি ছদ্মনামেও কিছু প্রবন্ধ লেখেন (মকসুদ, পৃ.৩১)[১৩]। তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ 'সতীর পতিভক্তি' ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হয়। এই ৬১ পৃষ্ঠার বইটি নারীর জন্য একটি উপদেশমূলক বই। তবে খায়েরন্নেসা সম্পর্কে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে খায়েরন্নেসা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু তা পালন করেন (১৯১০-এর দশকে?)। 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে খায়েরন্নেসা একটি উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হন। সেই যুগে তাঁর এই উদার মনোভাব ও কর্মজীবী ভূমিকা আজ বিস্ময় জাগায় বিশেষত যখন তা রক্ষণশীল মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন সদস্য দ্বারা সম্পন্ন হতে দেখা যায়।

আধুনিককালের প্রথম মুসলিম গদ্যলেখিকা হিসেবে তাহেরুন্নেসাকে গণ্য করা হয়। অনুমান করা হয় যে, তিনি ১৮৫০ সালের কিছু আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে মাত্র একটি লেখাই আজও সংরক্ষিত আছে এবং উনিশ শতকের 'ভদ্রলোক' দের বিখ্যাত সাময়িকী বামাবোধিনী পত্রিকায় ১২৭১ (বা.স) সনের ফাল্গুন (১৮৬৪) সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বামাগণের রচনা'। খুবই উন্নতমানের রচনাশৈলীতে লেখা এই প্রবন্ধে নারীর সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং সেই সাথে নারীশিক্ষার উপর জোর দিয়ে তার সমাধানও উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়।

মহিলা কবি ও লেখিকাদের এই প্রজন্মের অনেকেই 'অন্দরমহল' স্ব-শিক্ষিতা এবং প্রায়শই প্রচলিত সামাজিক বাধা-নিষেধ এবং মহিলাদের যেকোন ধরনের সামাজিক আত্মপ্রকাশ ও অংশগ্রহণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রাচীর অতিক্রমে সক্ষম ছিলেন। তাঁদের কার্যাবলীও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ভদ্রমহিলা'দের মতো মুসলিম মহিলাদের মধ্যে রীমিতো এক শ্রেণী তৈরি হতে আরও কয়েক দশক লেগে যায়।

২.৫ নারীশিক্ষার উন্নতি সাধন

পর্দার মতোই নারীশিক্ষার বিষয়টিও বিশ শতকে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। নারীকে শুধুমাত্র জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তার মর্যাদা উন্নীত করা নয়, নারীর কর্মবিনিয়োগক্ষেত্রেও বাস্তব পদক্ষেপের এক শক্তিশালী সহায়ক হিসেবে শিক্ষার মূল্য বিবেচিত হতে শুরু হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে শিল্পায়ন এবং আরও অধিক সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদা নারীমুক্তিকে তরান্বিত করেছিল। কিন্তু গৃহ থেকে নারীকে কর্মক্ষেত্রে আনার এই প্রক্রিয়ার (যদিও গৃহের বোঝা তার কাঁধেই রয়ে গেল, যা কখনও ঝেড়ে ফেলা যায় নি বা গেল না) সাথে শিক্ষাও এলো; একই সঙ্গে নারীকে নিয়ন্ত্রণকারী

Dhaka University Institutional Repository

সতীত্বের কড়া বিধান- যেমন পর্দা শিথিল হতে শুরু করে। ভারতে সার্বিক পরিবর্তন একটু ভিন্নভাবে এসেছিল এবং নারীর ভূমিকাসংক্রান্ত সার্বিক পর্যালোচনাও ভিন্ন রূপ নেয়।

বিশ শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোতে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে ৫২.৩% মুসলিম এবং ৪৫.২% হিন্দু ছিল। নারীর চাহিদার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষার অবকাঠামোর আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বৃটিশ সরকার অনুভব করে। 'নারীশিক্ষা কমিটি' ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১১ সালে আলোচনায় বসে। ১৯০১ সালে সিমলা সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা ধরনের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারের শুরু করা এই কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গে'র দরুন (শীলা বসু,১৯৮৮)[১৪]। সরকার তখনো বিরাজমান দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে, যেমন মক্তব ও পাঠশালাকে ব্যবহার করে এবং এক দ্বিমুখী অভিযান চালিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচীকে ধর্মনিরপেক্ষ করে এবং যতোসংখ্যক সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করে। আসাম ও পূর্ব বাংলাকে নিয়ে নবগঠিত প্রদেশের নবাব সলিমুল্লাহ এবং রায় দুলাল চন্দ্র দেব জনশিক্ষা পরিচালককে (ডি.পি.আই) এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নারীশিক্ষার উন্নতিসাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। এই কাজের জন্য 'নারীশিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়েছিল (Molla,1985) [১৫]।

এই সময়ে অর্জিত উন্নতির বেশিরভাগই ঘটেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এখানে বিশেষভাবে উলে-খ্য, ঢাকার ইডেন বালিকা স্কুল, ময়মনসিংহের আলেক-জান্ডার বালিকা স্কুল এবং চট্টগ্রামের ডঃ খাস্ত গির স্কুলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে প্রথমবারের মতো ইডেন স্কুলে মহিলা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং এইভাবে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকের অভাবজনিত এক বিরাট সমস্যার সুরাহা হয়।

১৯০১ সালে পূর্ব বাংলার ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৫৬৪ জন। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৬ সালে ১৬,৪৬৮ জনে ও ১৯১১ সালে ৫৬,৬৮৩ জনে উন্নীত হয়। মুসলিমদের মধ্যে পর্দার কঠোরতা তুলনামূলকভাবে বেশি বিদ্যমান বলে বুঝতে পেরে সরকার এই বাধা অতিক্রমকল্পে মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নতির নীতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে (যেমন মুসলিম বালিকাদের জন্য তাদের বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ ইত্যাদি)। পর্দাপ্রথা এবং বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার জন্য প্রচণ্ড বাধা হওয়া সত্ত্বেও ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ মুসলিম নারীশিক্ষার দিশারীগণ

প্রায় এই সময়ে লেখিকা, সমাজসেবী, বিদ্যানুরাগী, ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রদূত এবং মুসলিম নারীমুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কলকাতায় ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় কর্মজীবনের ধারার সূচনা করলেন। রংপুরের পায়রাবন্দ জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি তৎকালীন উচ্চবিত্ত মুসলিম জীবনধারার কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যেই লালিত হন। এই জীবনধারায় কোরান পড়ার সামর্থ্যের বাইরে অন্য কোন ধরনের জ্ঞানার্জনকে একেবারে হারাম করা না হলেও খুবই অপছন্দনীয় হিসেবে গণ্য করা হতো। রোকেয়ার জীবনী লিখতে গিয়ে শামসুননাহার মাহমুদ বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে বাড়িতে থেকে রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ও বোন করিমুন্নেসার এবং পরে তাঁর স্বামীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অন্দরমহলের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল ছিন্ন করে সামাজিক সংস্কারের বিশাল জগতে প্রবেশ করেন।

অবরোধপ্রথা (পর্দাপ্রথার এক বিকৃত ও অযৌক্তিক রূপ) এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে জেহাদ রোকেয়ার আমরণ সাধনা। মুসলিম নারীদের মধ্য হতে এই দুই অন্যায়ের উচ্ছেদকল্পে তাঁর জীবনধারা নিবেদিত ছিল। রোকেয়া তাঁর সাহিত্যকর্মে (উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গসাহিত্য, কবিতা) এবং সামাজিক কর্মধারায় মুসলিম নারীদের পর্দাপ্রথা ও অজ্ঞানতার নিগড় ভাঙ্গার প্রয়োজনীয়তার কথা অবিরাম উপস্থাপন করেছিলেন। স্বচ্ছদৃষ্টি এবং একাগ্রচিত্তসম্পন্না হয়ে (তাঁর পূর্বের বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের মতো) তিনি এক যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিতে সমাজ ও ধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশেষণ, যথা মানব-ইতিহাসে পুরুষশাসিত সমাজে বিভিন্ন যাঁতাকলে নারীদের চরম নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা সে যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর চিন্তাধারার এই পরিচ্ছন্নতায় আরো বিস্মিত হতে হয় যখন বিবেচনা করা হয় যে, গৃহশিক্ষায় ও স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিতা রোকেয়া শহুরে সামাজিক পরিবেশের কোন সুযোগ-সুবিধা পান নি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ সম্পর্কে ১৯০৪ সালে রোকেয়া তাঁর স্ত্রীজাতির অবনতি প্রবন্ধে লিখেছেন- '...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' (নবনূর, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম সংখ্যা)। এই প্রবন্ধটি যখন পরবর্তীকালে গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হয় তখন উক্ত পরিচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়।

রোকেয়া অবরোধ ও পর্দাপ্রথার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। পর্দাপ্রথা সামাজিক ভদ্রতার পরিচায়ক বিধায় অণুমোদনযোগ্য, কিন্তু 'অবরোধ প্রথা' পর্দাপ্রথার এক সামাজিক ও সাময়িক বিকৃত রূপ, তাই নিন্দনীয়। রোকেয়া নিজেও পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন এমনকি জীবনের কোন এক পর্যায়ে বোরকাও পরেছেন)। উনিশ শতকের অন্যান্য উদার সমাজসংস্কারকদের মতো নারীমর্যাদার

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যাকে ঘিরেই রোকেয়ার আহ্বান ছিল এবং তিনি একই অনিশ্চয়তা, বৈপরীত্য ও অবিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন(আমিন,১৯৮৮)[১৬]। পুরুষশাসিত সমাজে নারীসমস্যার সমাধান (যদিও কথাগুলো তখন ঠিক এইভাবে প্রকাশিত হয়নি) এবং নারীর আর্থিক মুক্তির উপায় হিসেবে শিক্ষাপ্রচার করতে গিয়ে তিনি এক বিরল, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।

নুরুন্নেসা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫) রোকেয়ার সমসাময়িক এবং বাংলার মুসলিম নারীমুক্তির অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও তাঁর লেখার মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টা (১৯২৩), জানকীবাঈ (১৯২৪) এবং আত্মদান (১৯২৫) উলেখযোগ্য। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সমিতি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁকে 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিও প্রদান করা হয়, যা কিনা তখনকার জন্য এক বিরল সম্মান। মামলুকুল ফাতিমা খানমের সাহিত্যকর্মও ১৯১২-১৯২১ সালের অন্তর্গত। রোকেয়া, নুরুন্নেসা ও ফাতিমা এঁরা সবাই উনিশ শতকের শেষ দশকসমূহে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় বিশ শতকে।

রোকেয়া শামসুন্নাহার মাহমুদকে (১৯০৯-১৯৬৪) একজন সহকর্মী এবং শিষ্যা হিসেবে পেয়েছিলেন। শামসুননাহার ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং রাজনীতিবিদ। নোয়াখালীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রথম দিশারী ছিলেন তাঁর মা এবং তাঁর উপর তাঁর নানা আবদুল আজিজের (পূর্বে উলেখিত 'মুসলমান সুহৃদ সম্মেলনে'র একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য) বিশেষ প্রভাব ছিল। যদিও মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে আবদুল আজিজ এক উলেখযোগ্য অবদান রাখেন, তথাপি তিনি সামাজিক নিন্দার মোকাবেল করতে সাহস পান নি, যা নিশ্চিতরূপে দেখা দিত যদি তাঁর এই প্রতিভাময়ী নাতনী পর্দাপ্রথাকে উপেক্ষা করে স্কুলে যেতো। তাঁর আগের ও পরের অনেক উদার মতাবলম্বী সমাজসংস্কারকের মতো সম্ভবত তিনি সাবধানতায় বিশ্বাস করতেন এবং প্রয়োজনবোধে আপোস করে নিতেন। তাই মাত্র নয় বছর বয়সে শামসুননাহারকে স্কুল থেকে ঘরে নিয়ে আসা হলো এবং গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২৬ সালে 'প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী' হিসেবে তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন ও বিশেষ কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। এই প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে সম্ভবত পর্দাপ্রথা ও শিক্ষার দ্বন্দ্বের বিশ শতকের গোড়ার দিকের এক সমাধান।

১৯৩৯ সালে ফজলুল হক যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তখন মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই শামসুন্নাহারকে একজন শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয়। কলকাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি রোকেয়ার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন' (রোকেয়ার নারীমুক্তি সংগ্রামের অর্থনৈতিক ফ্রন্ট) গড়ে তোলার ব্যাপারে। 'শামসুন্নাহারের কাজ শুরু হলো সেখান থেকে যেখানে রোকেয়া শেষ করেছিলেন'(শাহিদা,১৯৮৬)[১৭]। তিনি ছিলেন দুই যুগের সেতুবন্ধন- বিশ শতকের প্রথম দিকের দশকগুলো (যখন রোকেয়ার মতো নারীরা প্রায় একাই লড়াই করে চলেছেন) এবং বর্তমান যুগ (যখন একজন বাঙালি নারী, যার সামর্থ্য আছে, অন্তত পর্দার দোহাই দিয়ে তার শিক্ষাগ্রহণে বাধা দেয়া যাবে না)-এ দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন।

যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিবিশেষই ইতিহাসে অণুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকাকে কোনক্রমেই অতিরঞ্জিত বলা চলে না। ১৯১৬ সালে রোকেয়া কর্তৃক 'সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান' আঞ্জুমান-ই-সাওয়াতিন-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাকে বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষাবিদদের জন্য এক আদর্শ হিসেবে কাজ করে। রোকেয়া ও শামসুন্নাহারের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের নারী ও পুরুষকে নারীশিক্ষার প্রসারকল্পে কাজ করার উৎসাহ যুগিয়েছে। ১৯১৪ সালে রোকেয়ার স্কুল থেকে একটি বৃত্তি প্রদান যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই সময়ের পরিসংখ্যানে এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা হিন্দু ছাত্রীদের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী স্তরে (মাধ্যমিক) এই সংখ্যা দ্রুত নীচে নেমে যায়, যার কারণ পর্দা ও বাল্যবিবাহ (যা মুসলমানদের মধ্যে কঠোরভাবে পালিত হতো)। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে, যেমন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম নারী এই সময় খুব অল্পই উন্নতি লাভ করতে পেরেছে।

পূর্ব বাংলার শিক্ষা কার্যক্রমের ইতিহাসে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এক যুগনির্দেশক যোজনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ, যিনি বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করার পর ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯২৪-১২২৫ সময়ের মধ্যে ঢাকায় মেয়েদের জন্য চারটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত 'দীপালী সঙ্ঘ' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে ছাত্রীভর্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধা দিতে থাকে এবং পরে তা বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করার পরেও ছাত্রীদের জন্য এক পৃথক সময়সূচীর ব্যবস্থা করে। আরো অবাক হবার কথা এই যে, এই গুটিকতক অদম্য ছাত্রীকে পাহারা দেয়ার জন্য একজন মহিলা পরিচারিকাও নিয়োগ করা হয়েছিল। ভয় ছিল, এই কয়েকজন নারী ঘরের বাইরে আসার জন্য বহুদিনের বাধা ভেঙ্গেছে, না জানি কি বিপদ আসে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী হিসেবে ১৯২৭ সালে অঙ্কশাস্ত্রে মাস্টার ডিগ্রির জন্য যখন ফজিলাতুন্নেসা এই বিভাগে প্রবেশাধিকার পেলেন, তখন মুসলিম সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফজিলাতুন্নেসা মাস্টার ডিগ্রি পেলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এই ঘটনা পরবর্তী দশকসমূহে স্ত্রীশিক্ষার গতিসঞ্চার করে এবং মেয়েরা ক্রমেই বেশিকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে।

১৯৩৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে করুকণা গুপ্তার নিয়োগ আর এক মাইলফলক। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৩৩ সালে করুকণা ইতিহাসে এম.এ পাশ করেন। তাঁর এই নিয়োগ দক্ষিণ এশিয়ায় কর্মজীবী মহিলাদের এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১.William Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar, (1868), p-132

২.কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্ত্রীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।
৩.উদ্বৃত, David Kopf. Brahmo Samaj, p-53.

৪.শরিফা খাতুন, আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারী সমাজ, এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকা ১৯৮৫)।
৫ .David Kopf. Brahmo Samaj, pp-16, 34.

৬. Meredith Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905. (Princeton 1984). তিনি ভদ্রলোকের বিপরীতে নারীদেরকে বুঝাতে গিয়ে ভদ্রমহিলা শব্দটিকে জনপ্রিয় করেন।

৭. শরিফা খুতুন রচিত "আধুনিক শিক্ষা" গ্রন্থেও ২৯০ পৃষ্ঠা
৮.বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা।

৯.মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বও ১৯৮৩, ৬৩-১২৫।

১০.প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ৪৮-৫৬।

১১.আবুল আহসান চৌধুরী,আজিজুন নেসা খাতুন,ঢাকা ১৯৯৬,পৃ-১৪

১২.সৈয়দ আবুল মকসুদ,পথিকৃৎ নারীবাদ খায়রুনন্নেসা খাতুন,ঢাকা ১৯৯৮,পৃ-১৮।
১৩.প্রাগুক্ত,১৯৯৮
১৪.শীলা বসু, "রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ" ঐতিহাসিক, ২ এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যা, কলকাতা।
১৫ .M.K.U. Molla, Women's Education in Early Twentieth Century Bengal in the Bengal Studies. University of Michigan, East Lansing, 1985.
ঐ, ৪৩।
১৬. Sonia Nishat Amin, "Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Renaissance", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 24:2(1988). Pp-185-192.

১৭শাহিদা পারভীন, 'বেগম শামসুন্নাহার মুহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নারী শিক্ষা, জেন্ডার সচেতনতা ও আত্ম উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়- নারী শিক্ষা ,জেন্ডার সচেতনতা ও আত্ম উন্নয়ন

৩.১ বাংলাদেশে নারী শিক্ষার অবস্থা:

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অন্যতম ধারাটি হলো প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার অধিকার, যাই হোক সমাজে শিক্ষাকে প্রায়ই অবহেলা করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীতি নির্ধারকরা উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বালিকা ও নারীদের শিক্ষার সুযোগ তৈরির বিষয়টি জাতিসংঘের বড় বড় ডকুমেন্টে জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডওতে শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৯ সালের থাইল্যান্ডের জামিতানে ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপি আয়োজিত সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। ২০০০ সালের দিকে তাকিয়ে এর চূড়ান্ত ঘোষণায় বলা হয় "The most urgent priority" অর্থাৎ সবচেয়ে জরুরী বিষয় হলো বালিকা ও নারীদের শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার জেন্ডার সম্পর্কিত বিভাজনের অবসান ঘটানো।

২০০০ সালের মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়নি। বিদ্যালয় ত্যাগকারী ১২০ মিলিয়ন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ৮১ মিলিয়ন হলো বালিকা। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় বিশ্বব্যাপী ৯৪৮ মিলিয়ন নিরক্ষর বয়োবৃদ্ধর মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশী হলো নারী। বর্তমানে তিনজন বয়স্ক নারীর মধ্যে একজন লিখতে কিংবা পড়তে পারে না। ৫ জন বয়স্ক পুরুষের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় সাক্ষরতার হার পুরুষদের ৫০ শতাংশ (UNFPA 2001)[১]।

২০০১ সালের সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশনে শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় পৌছানোর উপর জোর দেওয়া হয় এবং বালিকা ও নারীদের মৌলিক শিক্ষা অর্জনে পূর্ণ সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় (the Dakar framework for Action 2000)[২]। উন্নয়ন নীতি, কর্মকান্ড ও প্রকল্পসমূহে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায় সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে, নারীদের শিক্ষা অর্জনে। জেন্ডার সমতা অর্জন জনগণের জীবনের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য অতিব জরুরী ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হয় বিভিন্নভাবে। অন্যতম নির্দেশক হলো দেশের শিক্ষার লেভেল জাতীয় উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদকে কার্যকরভাবে উন্নতি সাধনের ফলেই দেশকে সাহায্য করা যায়।

শিক্ষা হলো উন্নয়নের অন্যতম প্রয়োজনীয় টুল। শিক্ষা হলো অজ্ঞতা ও শোষণের শৃংখল ভাঙ্গার প্রধান হাতিয়াব এবং নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের উন্নতি বিধান (হক, ২০০০)[৩]। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বালিকা ও নারীদের শিক্ষা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সীর শিক্ষা বিষয়ক গবেষক ও পণ্ডিতদের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ সাল থেকে জাতীয় সরকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংগঠন ও এনজিও-দের মাধ্যমে অনেক নীতি, কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে । তাদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষায় বালিকাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশী নারীদের শিক্ষা অর্জন বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। জেন্ডার বৈষম্য রয়েছে পরিবারের মধ্যে, কম্যুনিটিতে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। বাংলাদেশের মতো একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবারে বালক ও বালিকাদের প্রতি সমান মূল্য দেওয়া হয় না। উপরন্তু, পিতামাতার মধ্যে নিরক্ষরতা বালিকাদের শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।

৩.২ নারী শিক্ষার উদ্ভবঃ জাতীয় পর্যায়ে পুরুষের সাক্ষরতার হার ১৯৬১ সালের ৩১.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৫৯.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে; একই সময়ে নারীদের সংখ্যা ১০.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫৮.৭ শতাংশে। নারী পুরুষের উভয়ের সাক্ষরতার হার নগর এলাকায় বেশি। শহরে পুরুষদের সংখ্যা ১৯৬০ সালের ৫৪.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে দাড়ায় ৬১.৭ শতাংশ এবং নারীদের সংখ্যা ৩১.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৬১.০ শতাংশে। পল্লী এলাকায় সাক্ষরতার হার ১৯৬১ সালে ২৯.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯৯৮ সালে ৫৮.২ শতাংশ। অন্যদিকে নারীদের সাক্ষরতার হার ১৪.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫৮.৫ শতাংশ। শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে, বয়স্ক পুরুষ সাক্ষরতার হার ১৯৭৪ সালের ৩৭.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৫৯.৪ শতাংশ হয়েছে। বয়স্ক নারী শিক্ষার হার ১৯৭৪ সালে ১৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ৫৯.৭ শতাংশে দাড়িয়েছে। শহরে নারী সাক্ষরতার হার ১৯৭৪ সালে ৩৩.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে হয়েছে ৫৯.৭ শতাংশ। পল্লী এলাকায় ১২.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩৭.৮ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালে ১৫-২৪ বছর বয়সী নারী পুরুষের সাক্ষরতার হার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় সমান। জাতীয় পর্যায়ে এই হার ১২ শতাংশ।

মাধ্যমিক লেভেলে ছাত্র ছাত্রী ঝরে পড়ার হারে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি। যাইহোক, এটি গ্রেড লেভেলে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশী ঝরে পড়ার হার ১২ লেভেলে। এই লেভেলে মোট ঝরে পড়ার হার ১৯ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী পুরুষের অনুপাতে লক্ষ্য করা যায় যে, এই হারটি ১৯৯৬ সালে ১৮০ থেকে নেমে ১১৮তে চলে এসেছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বালিকাদের বর্দ্ধিত ভর্তির এটি একটি নির্দেশক।

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক খাতে একটা সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। ফলে সাক্ষরতার হার ২০০০ সালে ১৯৯১ সালের ৩৫ শতাংশের তুলনায় ৬৪ শতাংশে উপনীত হয়েছে । মোট ভর্তির হার ১৯৯১ সালের শতাংশের তুলনায় ২০০০ সালে ৯৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে। ঝরে পড়ার হার ১৯৯০ সালের ৬০ শতাংশ থেকে কমে ২০০০ সালে ৩৩ শতাংশে এসেছে। ১৫.৫ মিলিয়ন ছেলেমেয়ের মধ্যে ৭.৯ মিলিয়ন হলো বালিকা এবং ৭.৮ মিলিয়ন হলো বালক। নীট ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে (PMED ১৯৯৯)[৪]।

মাধ্যমিক পর্যায়ে উচ্চ ঝরে পড়ার হার নারী শিক্ষার জন্য ভয়ংকর। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ-সহ সামাজিক অনিরাপত্তা, পাবলিক ক্রাইমে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ভাটা তৈরি করে। উপরোন্তু পিতামাতা ছেলেদের শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করতে পছন্দ করে। ঝরে পড়ার হার কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পিতামাতার মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৩ উচ্চ শিক্ষায় নারী: উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সংগৃহীত পরিসংখ্যানে একটা দুর্বল চিত্র ফুটে উঠে। গড়ে নারীদের মাত্র ১৯ শতাংশ উচ্চ শিক্ষায়রত। কৃষি ও প্রযুক্তির মতো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১২ শতাংশ ও ১১ শতাংশ। ডিগ্রি লেভেলে মেডিকেল কলেজের ৩৫ শতাংশ ডেন্টাল কলেজের ৪.৪ শতাংশের তুলনায় প্রায় ৩১ শতাংশ।

যাইহোক, একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা লক্ষ্যনীয়ভাবে বেশি এবং তারা সব স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। উচ্চ শিক্ষিত অসংখ্য নারী বেকার কারণ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, নারীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সাথে প্রাপ্ত চাকরির মানায় না।

৩.৪ নারী শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ:

গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সরকারকে একটি ইউনিফর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাধ্য করে এবং সকল ছেলেমেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ মানবাধিকার এবং শিশু অধিকার কনভেনশনের সাথে মিল রেখে করা হয়। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমিটিয়েনে অনুষ্ঠিত সবার জন্য শিক্ষা ফর্মসূচীতে বাংলাদেশ সাক্ষর করে এবং সবার জন্য শিক্ষার কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে । তখন থেকে প্রাথমিক ও উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯৭-২০০২) পরিকল্পনার ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিক বিষয়ে CEDAW ও বেইজিং, PFA-এর বাস্তবায়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সবার জন্য শিক্ষার উপর ২০০০ সালের ডাকার সম্মেলনে একটি কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর উপাদান হিসাবে 'বালিকা শিক্ষা' দশক উদ্বোধনের দাবি জানিয়ে বালিকাদের শিক্ষাকে জেন্ডার সমতা ও নারী শিক্ষার সাধারণ আলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বালিকা ও নারীদের শিক্ষা জাতির উন্নয়ন ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত এবং সকল উন্নয়ন নির্দেশকই বালিকা ও নারীদের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। (হোসেন ও ইউসুফ, ২০০১)[৫]।

ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং ২০১৫ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন-এর উন্নতমানের মৌলিক শিক্ষা অর্জনের অধিকার ও অর্জনে বালিকাদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এ জেন্ডার বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং জেন্ডার প্রধান ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (আহমেদ; ২০০১)[৬]।

৩.৫ বেইজিং কনফারেন্স ও এর পরবর্তী ঘটনাসমূহ: বেইজিং কনফারেন্সে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করা হয তার মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের অসমতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বেইজিং কনফারেন্সের (১৯৯৫) পর বাংলাদেশ সরকার নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ১৫টি মন্ত্রণালয়ের জন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা সাধারণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পার অন্যতম একটি পরিকল্পনা যৌথ কাজ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের ও PMED এর জন্য।

শিক্ষা ও পরিকল্পনার বিষয়ে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১. সমান শিক্ষার সুযোগ সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণ

২. নারী সাক্ষরতা নিশ্চিতকরণ।

৩. ভোকেশনাল শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও চলমান শিক্ষায় নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৪. বৈষম্যহীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া।

৫. শিক্ষা সংস্কার এবং সেই সাথে তাদের বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বন্টন করা।

৬. মেয়ে শিশু ও নারীদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষার আয়োজন করা।

৭. নারী শিক্ষার অগ্রগতি, বৈষম্যমূলক সাক্ষরতার হারের বিলোপ, বৈষম্যমূলক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও উন্নয়নের প্রধান ধারায় নারীদের নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কার্যকরী ও স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করা।

৮. মেয়ে শিশু ও নারীদের শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়ে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা বিলোপের জন্য অল-আউট প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৯. দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বালিকাদের জন্য টিউশন ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

১০. টেকসই উন্নয়ন এবং চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নারীদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ ও শক্তিশালীকরণ।

১১. মেয়ে শিশু ও নারীদের জন্য সমান শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা; সবক্ষেত্রে অসমতা দূর করা। শিক্ষাকে সার্বজনীন করা, বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের থাকার জন্য নিরক্ষরতা লোপ করা।

১২. জীবনমুখী শিক্ষায় নিশ্চিত করতে সব ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নারীর সমান অধিকার দেওয়া।

১৩. ভোকেশনাল, প্রযুক্তিগত ও উচ্চ শিক্ষায় নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৩.৬ জাতীয় শিক্ষা নীতি ও নারী শিক্ষা

সাম্প্রতিককালে সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি ঘোষণা করেছে। নারী শিক্ষা বিষয়ে একটি আলাদা অধ্যায় পলিসিতে যুক্ত করার সময় কমিটিতে ৫৯ জনের মধ্যে ৩ জন নারী সদস্য ছিল এবং পর্যালোচনা কমিটিতে ৬ জন ছিল যার মধ্যে কোন নারী সদস্য ছিল না। যাই হোক, নীতিমালায় বাংলাদেশের নারী শিক্ষা ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। নীতিমালার লক্ষ্য হিসেবে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বৃহত্তর নারী মুক্তির জন্য স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া হয়। নারীদের উচিত কেবল জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিনির্মাণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাই নয় বরং তাদের সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে তাদের প্রধান ভূমিকা পালন করার আছে। নারী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটা মনোভাব ও আত্মবিশ্বাস তৈরী করা যাতে নারী মুক্তি ও ক্ষমতায়নের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর হয়ে যায় (হোসেন ও ইউসুফ,২০০১)[৭]।

নারী শিক্ষা শিরোনামে নীতিমালার ১৭ অধ্যায়ের পলিসিতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের নারীরা আংশিকভাবে সমগ্র populate বা সাধারণ সামগ্রিক বঞ্চনার শিকার, নীতিমালায় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করার পদপেক্ষপের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নারীকে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে-

১. নারী শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং ব্যক্তিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. নারীর জন্য অনানুষ্ঠানিক পার্ট-টাইম শিক্ষার আয়োজন করা উচিত।
৩. পেশাগত ও উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত তাদের বর্ধিত অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. নারীর প্রতি সামাজিক সম্মানের পক্ষে ইতিবাচক ও প্রগতিশীল সামাজিক মনোভাব বৃদ্ধি করতে প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস সংশোধন করতে হবে।
৫. মাধ্যমিক স্টেজে জেন্ডার নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রকে আলোচনার বিষয়বস্তু পছন্দ করার সমান সুযোগ থাকতে হবে।
৬. নারী পলিটেকনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
৭. মেয়ে শিশুকে প্রকৌশলী, মেডিকেল, আইন ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহিত করা উচিত।

দরিদ্র ও মেধাবী নারী শিশুদের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া উচিত এবং সামান্য সুদে ব্যাংক লোনও দেওয়া উচিত।

৩.৭ নীতিমালার কার্যসমূহ: জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষার স্ট্রেটেজিসমূহ

২০০০ সালের সমাপ্ত বছরে সবকাব শিক্ষা ক্ষেত্রে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সাধারণভাবে এবং নারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিভিন্ন স্ট্রেটেজি গ্রহণ করেছে। এসব স্ট্রেটেজির সাফল্য মেয়ে শিশুদের

Dhaka University Institutional Repository

অধিক হারে বিদ্যালয়ে গমন এবং নারীদের সাক্ষরতা কর্মসূচীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে কতক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হলো।

১. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, কম্যুনিটি বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা।

২. ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন কার্যকর করা।

৩. ১৯৯২ সালে ৯৮টি থানা এবং ১৯৯৩ সালে সারা বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু।

৪. দরিদ্র পিতামাতার খরচের পরিমান কমানোর জন্য ১৯৯৩ সালের শিক্ষার মাধ্যমে খাদ্যের কর্মসূচী চালু করা হয়। সাধারণত প্রত্যেক শিশুকে ১৫ কেজি ময়দা কিংবা ১২ কেজি চাল দেয়া হয় ।

৩.৮ পল্লী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা হলো। এখানে বিবাহের বয়সের ক্যাটাগরিতে নমুনাবন্টন করা হয়েছে।উত্তরদাতাদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা নাই বা নারীর জ্ঞান মণ্ডলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তাদেরকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল ও তাদের অধস্তন করে তুলতে পারে। সবচেয়ে হতাশা ব্যঞ্জক বিষয়টি হলো এই যে দশজন নারীর ৪ জনই তাদের স্বামীর সাথে অসন্তুষ্টমূলক সম্পর্ক। তথ্য মিডিয়ায় তাদের প্রকাশ সামান্য ৫১ শতাংশ। উত্তরদাতাদের শারীরিক গতিশীলতা সীমিত যা তাদেরকে উত্তম জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। উত্তরদাতাদের এক বড় অংশ শিক্ষা/প্রশিক্ষনের যা সহযোগিতামূলক সমবায় এবং ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা নাই কারণ এক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ভীষণভাবে বাহ্যিক সমাজ বাধা কিংবা প্রক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত।

৩.৯ পল্লী নারীর সামাজিক মর্যাদা: যেসব নারীর আয় আছে, শারীরিক সৌন্দর্য আছে (প্রধানত তাদের দেহের রং), বাপের বাড়ীর বিশাল সামাজিক মর্যাদা আছে, পুত্র সন্তান আছে এবং যার বিয়ের সময় যৌতুক দিতে সক্ষম তারা হতভাগা, দুস্থ, মানসিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম নিরক্ষর, বন্ধ্যা এবং অতি তরুনীদের তুলনায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী বলে প্রতীয়মান হয়। নিরক্ষরতা এবং সামান্য শিক্ষা পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্ন মর্যাদার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। বিবাহের প্রতিশ্রুতি এবং নারীর মর্যাদা নির্ভর করে তার সৌন্দর্য্য, গায়ের রং, শিক্ষা ও যৌতুকের উপর। এখানে এই নির্দেশ করে যে, নারীর অধস্তণতা শক্তিশালী ঐতিহ্যগত প্রত্যক্ষ, বিশ্বাস ও পূর্ব সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত, এই পূর্ব সংস্কারের পরিবর্তন ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন অর্জন করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০ পল্লী নারীদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতার বিস্তৃতি: সহিংসতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যৌতুক বিষয়ে বৈষম্য, নারীর কাজের অস্বীকৃতি, জন্ম নিবন্ধন এবং নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যই পল্লী নারীর জেন্ডার সচেতনতা ।

১. শারীরিক আগ্রাসন তালাকের হুমকি, বহুবিবাহ, জীবিকা নির্বাহের সাপোর্ট, বিবাহোত্তর সম্পর্ক এবং মানসিক নির্যাতন পারিবারিক লেভেলে নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহিংসতা। এখানে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা উদ্দীপক হবে যে, নির্যাতিতদের পারিবারিক আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা বেশ অবগত, তারা এ বিষয়ে একমত যে, শোষিত নারীরা স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিকট থেকে ন্যায্য বিচার পাবে। পারিবারিক আদালতের মাধ্যমে আরোপিত ঐ শাষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে সহযোগিতা করবে।

২. **রাজনৈতিক সচেতনতা:** জরীপকৃত নারীদের মধ্যে একটা বড় অংশ মনে করে নারীদের কম্যুনিটি উন্নয়নে পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ তৈরি করে দেওয়া উচিত। যদিও গ্রামীণ নারীরা নারী নেত্রির সাথে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারে তাদের সমস্যা নিয়ে, তবুও তারা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে, পুরুষের সাথে সরাসরি মিথস্ক্রিয়া করা পাপ যা সামাজিক সীমা অতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। সাক্ষরতার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা ও কার্যকরী পছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকও বটে।

৩. **সম্পত্তির উত্তরাধিকার:** পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারের প্রতি মনোভাব বিষয়ে উত্তরাধিকারের প্রতি মনোভাব বিষয়ে পূর্বের একটি গবেষণায় এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, উত্তরদাতাদের ৭৮ থেকে ৮৪ শতাংশ পুরুষ শিশুদের বেশী সম্পত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মত পোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, মনসুরের (১৯৯৯) আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ বাংলাদেশী নারীদের ৭৭ শতাংশ পিতৃ সম্পত্তির বৈধ অংশ থেকে বঞ্চিত, বিশেষ করে জমির। যেহেতু যৌতুক প্রদান বালিকাদের বিয়ের পূর্বশর্ত, তাই পিতার পরিবার মেয়েদের বিয়ের পর সম্পত্তি প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

৪. **বিয়ের বয়স:** জরীপকৃত নারীদের প্রায় ৩৬ শতাংশই বাল্য বিবাহ সমর্থন করেন। অন্যদিকে ৬৩.৫ শতাংশ এটি বিরুদ্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা যুক্তি দেখান যে, বাল্য

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহিত নারীদের স্বাস্থ্য ঝুকির মুখে থাকে, এসব ঝুকির মধ্যে রয়েছে অল্প ওজনের শিশু জন্ম, কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডেলিভারীর পর মায়ের মৃত্যু।

৫. স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই বিবাহ বিচ্ছেদের সমান অধিকার রয়েছে একই সময়ে, যাই হোক, তারা তাদের স্বামীর ডিভোর্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহায়ত্ব বোধ করে। আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে, একজন নারী তার স্বামীকে সহজে ত্যাগ করতে পারেন না, তার উপর নির্ভলশীলতার কারণে। বিপরীতভাবে, ৪৫ শতাংশ নারী ডিভোর্সের ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষমতার পক্ষে মতামত পোষণ করেন। তারা এক্ষেত্রে বিদ্যমান ধর্মীয় রীতিনীতির কথা তুলে ধরেন। প্রকৃতপক্ষে: পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের ডিভোর্স দিতে অপরিসীম ক্ষমতা ভোগ করে। যাইহোক, পুরুষদের প্রায়ই ডিভোর্স দিতে ঝামেলা পোহাতে হয় না। যাইহোক গবেষণায় দেখা যায় যে, আয়-উপার্জনকারী মহিলাদের চেয়ে আয় উপার্জনহীন মহিলারা বেশী ডিভোর্সের শিকার এবং তারা বেশী অবহেলিত।

৩.১১ বাংলাদেশের পল্লী নারী জেন্ডার সচেতনতা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে নারী পুরুষ সমান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে না (ইসলাম, ২০০০)[৮]। বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও নারীর অধিকার সম্পর্কিত অধিকাংশ চলতি আলোচনায় চারটি পারস্পরিক আন্তনির্ভরশীল বিষয় উঠে এসেছে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, আইন ব্যবস্থা, আদর্শ ও ধর্ম। এসকল বিষয় নারীদেরকে সামাজিক ব্যবস্থায় পশ্চাদপদ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে (ইপস্টেইন, ১৯৮৬)[৯]। নারী ও পুরুষের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য সূচীত হয়েচে কারণ যে কৃষিখাত জাতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঐতিহ্যগতভাবে, পুরুষ হলো আয়-উপার্জনকারী এবং অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারীদেরকে সামাজিক পশ্চাদপদ অবস্থায় রেখেছে এবং পরিবারের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাই হোক, বাংলাদেশে নারীর অধস্তনতা বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার ফলে যা গৃহে ক্ষমতা সম্পর্ক নির্ধারন করে (কবির, ১৯৯৯)[১০] নারীদের ক্ষমতাহীনতার উদ্ভব ঘটে নিরক্ষরতা, সচেতনতার অভাব, সামান্য জ্ঞান ও দক্ষতার অবাব থেকে (লাজো, ১৯৯৫)[১১]।যদিও নারী বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক,তথাপি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবাহ, সন্তান, কর্মসংস্থান ও সামাজিক অসমতা সম্পর্কিত ২০টি নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে নারীর মর্যাদা (NCBP, ২০০০)[১২]।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও সীমিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার এর মতো কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যা বাংলাদেশের অনেক নারীর কষ্টের কারণ। বিশেষ করে পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ নিম্ন শিক্ষার অন্যতম কারণ যা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিম্ন অংশগ্রহণের কারণ যেহেতু তাদের শারীরিক গতিশীলতা বিয়ের পরে স্থবির হয়ে পড়ে (খাতুন, ২০০২)[১৩]। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান নয় কারণ কন্যা তার ভাইয়ের অর্ধেক শেয়ার পায় এবং স্ত্রী মৃত স্বামীর ১/৮ অংশ পায় (ADB, ২০০১)[১৪]। এভাবে, নারীর জীবনের অধিকাংশ দিকই, বিশেষ করে নারীর পছন্দের স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সম্পত্তির অধিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজেব রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (সেবসটাড ও কোহেন, ২০০২)[১৫]। ফলে তারা সন্তান লালন পালনের জন্য উৎপাদন ইউনিট হিসেবে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে (আহমেদ, ২০০১)[১৬]। নারীর ক্ষমতায়ন এসব সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য প্রধান স্ট্রেটেজি হতে পারে এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার আইন প্রণয়ন করেছে যেমন ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন।

এখানে এ অবস্থার জেন্ডার সচেতনতার অর্থ ব্যাখ্য করা যথাযথ হবে যে, মাসকোটওয়ান ও সিয়ালি (২০০১) জেন্ডার সচেতনতাকে বিভন্ন প্রয়োজনের স্বীকৃতি, প্রত্যাশা ও নারী পুরুষের জীবনের আয়ুর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা তাদেব মধ্যে অসমতা তৈরি করে এবং এগুলো পরিবর্তনশীল। বর্তমান আলোচনায় জেন্ডার সচেতনতা বলতে জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য থেকে যে সমস্যা তৈরি হয় তার চিহ্নিত করার নারীর ক্ষমতা বুঝায়। এই সচেতনতাকে প্রকল্প, কর্মসূচী ও নীতিমালার জেন্ডার বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায়।

৩.১২ জেন্ডার সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন: নারীর ক্ষমতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক, জ্ঞানভিত্তিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রাগুলো অন্যতম। (স্টোমকুইশট, ১৯৯৫)[১৭]। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তথ্য নেটওয়ার্কে বলা হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়নের ৫টি মাত্রা রয়েছে যেমন নারীর আত্মমূল্যায়ন বোধ, পছন্দের স্বাধীনতা, সুযোগ সুবিধা ও সম্পত্তির অধিকার, নিজের জীবন নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাত্রাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা (পপিন, ১৯৯৫)[১৮]। এ থেকে এটি নির্দেশ করে যে, ক্ষমতায়নকে শুধু যে সমাজের উপর নিয়ন্ত্রন হিসেবে উপলব্ধি করা হয় তা নয়, বরং বর্দ্ধিত সক্ষমতার মাধ্যম হিসাবে যা নারীর সচেতনতাব আভ্যন্তরীন রূপান্তরের এবং বৃহত্তর আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে এবং নারীর সচেতনতার রূপান্তর হিসাবে দেখা হয়েছে যা সম্পত্তির অধিকারে বাহ্যিক বাধার অতিক্রম করতে কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনশীল ঐতিহ্যগত আদর্শ অতিক্রম করতে সক্ষম করে তুলেছে (সেন ও বাটলিওয়ালা, ২০০০)[১৯]। অনেক গবেষকই একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম মর্যাদার বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন (এন্ডারসন, ১৯৯৬)[২০]। এই ধরনের ক্ষমতাকে রাউল্যান্ডসের ভাষায় power within হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যার অর্থ আত্মমর্যাদা সচেতনতা কিংবা সচেতনতা জাগিয়ে তোলা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কারো নিজস্ব ক্ষমতায় বিশ্বাস করার মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষমতা বোঝায়। কোন ব্যক্তির এরূপ আভ্যন্তরীন ক্ষমতা তার আত্মবিশ্বাসী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় যা প্রায়ই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঘটে থাকে (ফ্রাইডম্যান, ১৯৯২)[২১]। এই ক্ষমতার অভাব ঘটলে মূল্যহীনতার অনুভূতি জাগে যা নারীর শোষণকে নির্দেশ করে। নারীকে উঠিয়ে নেওয়ার মতো অনেক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য থাকে power within লেভেলে পরিবর্তন ঘটানো।

অতএব, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীর এই দুর্বল অবস্থা থেকে উপরে নিয়ে যেতে হলে নারীর আত্ম উপলব্ধি এবং জেন্ডার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন (চেন ও মাহমুদ, ১৯৯৫)[২২] আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, অসুবিধাজনক অবস্থানে নারীর ক্ষমতায়ন তাদের নিজস্ব পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রন অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে অর্জিত করা যায় (মাসকটওয়ান ও সিয়াল, ২০০১)[২৩]। এভাবে ক্ষমতায়ন হলো প্রথম ব্যক্তির মধ্যে সম্ভাবনাময় পরিবর্তনশীল ক্ষমতার এমন একটি প্রক্রিয়া এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামাজিক পর্যায়ে সম্পর্কের পরিবর্তন। এরূপ পরিবর্তনসমূহকে স্থায়ী রূপ দিতে হবে এবং এভাবে দীর্ঘদিনে বর্তমানে কয়েকটি স্ট্রেটেজিক পদক্ষেপ এই আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

এই আলোচনা থেকে এটি অনুমান করা যায় যে, কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু উদ্দীপনামূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দশটি নির্বাচিত জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে তাদের সচেতনতার স্তরকে প্রতিফলিত করে পল্লী নারীর ক্ষমায়ন সম্ভব। এসব পদক্ষেপের দক্ষতা প্রধানত প্রচলিত নীতিমালা ও আইনের ফান্ডিং সুবিধা এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। এখানে আরো উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, ধর্মীয় বাধা এবং দুর্নীতি প্রধান কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয় যা বাংলাদেশের নারীর উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে জরুরী। যেহেতু শিক্ষা, প্রশিক্ষন, তথ্যের উৎস্য এর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের মতো কিছু ইতিবাচক সুযোগ রয়েছে, যা বর্তমান বিদ্যমান আস্থার কার্যক্রম হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে। এটি পর্যায়ক্রমে পল্লী নারীদের আত্মনির্ভরশীলতার আত্মমর্যাদার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩ পল্লী নারীর মর্যাদা: পল্লী নারীর মর্যাদা বলতে এখানে পরিবারে এবং কম্যুনিটিতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে নারীদের উপলব্ধি নির্দেশ করা হয়েছে। অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে যা পুরুষের তুলনায় আপেক্ষিক এবং মর্যাদা হলো সামাজিক মূল্যবোধ । নারীর অবস্থান ও মর্যাদা তৈরি হয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে ঘিরে যেমন সম্পত্তিতে অধিকার ও ব্যবহার, মালিকানা নিয়ন্ত্রন, আইনগত ও আদর্শগত কাঠামো, শিক্ষা, তথ্য ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১.UNFPA: (1994) Program of Action adopted at the ICPD, Cairo, September.

২.The Dakar framework for Action,Dakar,Senegal,2000

৩. Mahbub-ul Huq Human Development Center: (2000): Human Development in South Asia- 2000: The Gender Question. University Press Limited, Dhaka.

৪.Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh: (1999): Gender Dimensions in Development - Statistics of Bangladesh, Dhaka.

৫.Mosharaf Hossain and Anisatul Fatema Yousef: (2001) Future of Girls' Education in Bangladesh: Academy for Planning and Development, Dhaka.

৬.Shamima Ahmed: (2001) "Gender and Primary and Mass Education", Paper pesented at the. National Workshop on Gender and Education, organized by Steps Towards Development, Dhaka.

৭ . Ibid,2001

৮. Islam,M (2000) women look forward ,p-4,in ,M Ahmed(ed) Bangladesh in thc New Millenium,Dhaka:Community Development Library

৯. Epstein,T,S(1986) Socio-cultural and attitudinal factors Affecting the status of women,P-64,in A.K Gupta (ed) women and society,New Delhi,

১০. Kabeer,N (1999) Resources ,agency,Achievements reflections on the measurement of women's empowerment,Development and change,p-435-464.

১১. Lazo,L(1995) some reflections on the empowerment of women`pp23-37,

১২ .NCBP(2000) Gender Equality,development and Peace for thc twenty first century-NGO committee in Beijing :Women for women

১৩.Khatun,T,(2002) gender-related development Index for 64 Districts of bangladesh,CPD_UNFPA Programme and sustainable development

১৪. ADB(2001) Women in bangladesh,country briefing Paper.Manilla:Asian development Bank

Dhaka University Institutional Repository

১৫. Sebstad,J and Cohen,m (2000) Microfinance Risk Management and Poverty ,Washington DC

১৬ . Ahmed F (2001) gender Division of Labour:Bangladesh Context,Steps Towards Development,6(1),7-26

১৭ .Stromquist,P.N (1995) The theoretical and Practical bases for Empowerment,PP,13-22

১৮ . POPIN(1995) Guidelines on women's Empowerment for the UN Resident Co-ordinator System,United nations population Information network.

১৯. Sen,G.and Batliwala,S(2000) Women's empowerment and Demographic processess,Moving Beyond Cairo,PP 95-118.

২০.Anderson,j,(1996) yes,But is it empowerment? Initiation, implementation and outcomes of community action,PP-69-83

২১.Friedmann,J.(1992) empowerment:the politics of alternative development,cambridge:blackwell publishing.

২২.Chen,M and Mahmud,S (1995) Assessing change in women's lives:a conceptual framework,working paper no-2,BRAC-ICDDR,B Joint project at Matlab,Dhaka.

২৩ . Muskotwane,R and Siwale ,R.M (2001) Gender awareness and Sentitization in Basic Education,paris :UNESCO basic Education Division.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ক্লাস শেষে নিজেদের মধ্যে গল্পেমত্ত ছাত্রী বৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়-বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৪.১ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার প্রথম স্তর। অবশ্য দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নামে একটি শিক্ষাস্তর রয়েছে। তবে সেটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও চালুকৃত নয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করে তোলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মুল লক্ষ্য অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার প্রতি শিশুর আগ্রহ তৈরি করা। বাংলাদেশের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো সাধারণভাবে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১। প্রাক প্রাথমিক স্তরঃ ছোট ওয়ান/কিন্ডারগার্টেন ৩-৫ বৎসর বয়সী শিশু।

২। প্রাথমিক শিক্ষাঃ ১ম-৫ম শ্রেণীঃ ৬$^{+}$-১১ বৎসর বয়সী শিশু।

৩। মাধ্যমিক শিক্ষাঃ এর মধ্যে আবার তিনটি অংশ রয়েছে-

(ক) নিম্ন মাধ্যমিকঃ ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীঃ ১২-১৪ বৎসর বয়স সীমা।

(খ) মাধ্যমিকঃ ৯ম-১০ম শ্রেণীঃ ১৫-১৬ বৎসর বয়স সীমা।

(গ) উচ্চ মাধ্যমিকঃ একাদশ-দ্বাদশঃ ১৭-১৮ বৎসর বয়সসীমা।

৪। উচ্চ শিক্ষাঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষাঃ ১৮$^{+}$... বয়সের অধিক বয়সী

শিক্ষা ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, শুরুতে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানত স্থানীয় উদ্যোগে বিকশিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর পর সরকার ১৯৭৩ সালে এক ডিগ্রী জারির মাধ্যমে দেশের ৩৬,০১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী স্বীকৃতি প্রদান করে। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের শিক্ষাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে ১৯৭২ সালের ২৬ মে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশন বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিম্নোক্তভাবে-

৪.২ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

১. শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।

২. শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যাবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন।

৩. মাতৃভাষায় লিখন, পঠন ও হিসান রক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, তদুপরি ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে যে সব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সবের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি।

৪. পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি।(শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট,১৯৭৮)[১]

Dhaka University Institutional Repository

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে ১৯৮৮ সালে ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ এর নেতৃত্বে দেশে আরেকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এটি মফিজ উদ্দিন কমিশন বা বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন উল্লেখ করেন, স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ও বাহন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিকসমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনেব জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা হয়।(শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট,১৯৮৮)[২]

১. সাক্ষরতা, সংখ্যা ও সংখ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলিক যোগ্যতা অর্জন।

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুধাবন।

৩. শিক্ষা ও কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কাজ ও শ্রমের মর্যাদার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

৪. স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য অভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

৫. পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন।

৬. সকল নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি।

৭. সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।

৮. ব্যক্তি, পরিবাব সদস্য, সমাজ সদস্য ও সুনাগরিক হিসেবে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

৯. দেশ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

১০. জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ও শ্রদ্ধাবোধ জাগানো।

পরবর্তীতে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদ্যমান জটিলতা থেকে মুক্ত করে একবিংশ শতাব্দির উপযোগী ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এটিই দেশের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষানীতি। এ কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ (জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন,১৯৯৭)[৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালের জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। কাজেই এই স্তরের শিক্ষা, যাকে আজকাল মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদি শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়, তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যত গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে অনেককে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কর্মজীবন আরম্ভ করতে হয়, আবার অনেকে পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করে। এই দুই ধরণের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার। তাই-

১. প্রাথমিক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাকে জীবনভর শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী করে গড়ে তুলবে এবং তার মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ করবে। মৌলিক শিখন চাহিদার মধ্যে পড়ে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন।

২. প্রাথমিক শিক্ষা সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে শিশুদের ব্যবহারিক সাক্ষরতা সুদৃঢ় করা। এই স্তরের শিক্ষাকাল শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবেগিক নৈতিক গঠন ও অর্থপূর্ণ কায়িক শ্রমের প্রস্তুতি গ্রহণেরও সময়।

৪. প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের মৌলিক শিখন চাহিদা, পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। শিশুদের মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহল সৃজনশীলতা, অধ্যাবসায়, শ্রম, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা এসব বাঞ্ছিত গুণাবলী জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

৫. বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তারের লক্ষ্যমাত্রা মোটামুটি অর্জিত হলেও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ও তাদের অর্জিত শিক্ষার মান সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষাদানের মান দুর্বল বলেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে বিদ্যালয়ে প্রায়শ অনুপস্থিত থাকে বা অকালে ঝরে পড়ে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষায় মানোন্নয়নের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হল-

শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সন্তোষজনক পর্যায়ে আনা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা অর্থাৎ বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের শিক্ষাদানের চেয়ে শিক্ষার্থীর স্বশিখনের ওপর বেশি গুরুত্বদান, সনাতন পদ্ধতিতে সমগ্র শ্রেণীকে এক সঙ্গে পড়ানোর পরিবর্তে শ্রেণীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে কর্মকেন্দ্রীক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

৬. ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা। এসব লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একটি জাতির অগ্রগতি সাধনে ভিত্তি তৈরি করার প্রয়াসে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অতুলনীয়। সে কারণে দেশে একটি শক্তিশালী, গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর ভবিষ্যত শিখনদ্বার উন্মুক্ত করে এবং তাকে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত্তি তৈরি করে সুতরাং তার প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার- শিশুর প্রস্ফুটনশীল ক্ষমতা ও সামর্থের সুসামঞ্জস্য বিকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি তৈরি করা। পাশাপাশি শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক একটি জাতীয়, মানসম্পন্ন আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সকলকে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৪.৩ প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো

সুদীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো প্রচলিত রয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশের ৬$^{+}$ বছর বয়সী শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ১১ বছর বয়সে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কাঠামো হিসেবে এদেশে স্বীকৃত এবং প্রচলিত। কিন্তু উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা স্তর গড়ে উঠেছে। ঐ সমস্ত দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের কাঠামো হিসাবে পরিগণিত। পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষার প্রথম স্তরকে প্রাইমারী বা প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয় না। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার প্রথম স্তরকে 'এলিমেন্টারী' শিক্ষা বলা হয়। কোথাও আবার 'ফান্ডামেন্টাল' কিংবা 'বেসিক' শব্দগুলিও ব্যবহার করা হয়। প্রাইমারী, এলিমেন্টারী, বেসিক কিংবা ফান্ডামেন্টাল যে শব্দটিই ব্যবহার করা হোক না কেন এটি মূলত একটি দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তরকেই নির্দেশ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো পাঁচ বছর মেয়াদী। অর্থাৎ ৬$^{+}$ বছরের শিশুরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ১১ বছরের বয়সের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করে। অবশ্য বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (১৯৭৪) দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে আট বছর

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদী করার সুপারিশ করা হয়। এ সম্পর্কে কমিশনের মতামত নিম্নরূপ (শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট,১৯৭৪)[৪]

পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে আট হতে বার বছরের বাধ্যতামূলক (প্রাথমিক) শিক্ষার মেয়াদ চালু রয়েছে। আমাদের বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাইমারী শিক্ষা দায়িত্বশীল নাগরিক ও উন্নত ব্যক্তি গঠনের জন্য যথোপযুক্ত নয়। কারণ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে শিশুমনে ধারণা ও বোধশক্তি জাগ্রত করার এবং অর্থকরী বিদ্যার প্রাথমিক বিষয়গুলি তাকে শিক্ষা দেবার মত সময় পাওয়া যায় না। আমরা মনে করি, আট বছরের কম মেয়াদী স্কুল শিক্ষায় এ সব উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয় এবং অষ্টম শ্রেণীর পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও অন্যান্য যেসব কোর্স প্রবর্তনেব সুপারিশ আমরা করছি সেগুলির সুষ্ঠু ভিত্তি রচনাও সম্ভব নয়। সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য এই আট বছরের শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে সর্বশেষ গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও (১৯৯৭) দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে আট বছর মেয়াদী করার প্রস্তাব করেন। তাঁদের সুপারিশ (শিক্ষা প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন,১৯৯৭,পৃ-৪২)[৫]

বর্তমানে চালূ পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত জীবন ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সারা পৃথিবীতেই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবন-দক্ষতার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জনের এবং জীবনভর শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করার সুপারিশ করেছে। বুনিয়াদি শিক্ষার আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ আট বছর করা প্রয়োজন; এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে শিক্ষক সংখ্যা বহুগুণে বাড়াতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটা ছোটখাট গ্রন্থাগার থাকবে।

৪.৪ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশ ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের অবস্থান করে নেয়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম দায়িত্ব হিসেবে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের জন্য ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে একটি আইন পাস করা হয় এবং জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলোতে কর্তব্যরত পাঁচ জন (৫) শিক্ষককে (প্রতি স্কুল থেকে) সরকারি চাকুরি হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং সরকার দেশের ৩৬,০১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) শিক্ষা বিষয়ে যে সকল উদ্দেশ্য স্থির করা হয় তার ভেতর একটি ছিল, স্কুল গমনোপযোগী সকল শিশুকে আনুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে, যা অন্তত প্রাথমিক স্তরের নিম্নে হবে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতের মোট অর্থের ৫৭.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। এর পরিমাণ ছিল মোট শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা আঠার ভাগ (১৮%)। বরাদ্দকৃত অর্থের খরচের খাতগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো, যা থেকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সরকার কর্তৃক গুরুত্ব প্রদানের একটি চিত্র পেতে পারি। যেমন-

বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ-

খরচের খাত	টাকার পরিমাণ
ক. নির্মাণ ও সংস্কার	৩৩ কোটি টাকা
খ. শিক্ষা উপকরণ	৮.৩৪ কোটি টাকা
গ. পাঠ্যপুস্তক	৭.৩৮ কোটি টাকা
ঘ. দুই শিফট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত প্রশিক্ষকের বেতন বাবদ	৯ কোটি টাকা

উপর্যুক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সঙ্গে আরও ৭.৫০ কোটি টাকা ৩টি মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসহ প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর উন্নতিকল্পে বরাদ্দ করা হয়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের আংশিক বাস্তবায়নে সমর্থ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও পাঁচ হাজার বৃদ্ধি পেলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে তিন হাজার সাতশ উনপঞ্চাশটি (৩,৭৪৯) প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ কর্মসূচীর বহির্ভূত থেকে যায়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭৩ সালে ছিল ৭.৮ মিলিয়ন, যা ১৯৭৮ সালে ৮.২ মিলিয়নে উন্নীত হয়। উল্লেখিত সময়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২.৭ মিলিয়ন হতে ৩ মিলিয়নে উন্নীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সংখ্যা ১৯৭৩ সালে এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ জনে (১,৫৫৭৪২) নির্দিষ্ট ছিল, তা ১৯৭৩ সালে বেড়ে এক লাখ ছিয়াশি হাজার একশ চুয়ান্ন জনে (১,৮৬১৫৪) পরিণত হয়। অত্যন্ত সুখের কথা এই যে, উক্ত সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল এক লাখ সাতাশ হাজার সাতশ বার জন (১,২৭,৭১২)। অর্থাৎ মোট শিক্ষক সংখ্যার উনসত্তর (৬৯) ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অন্তবর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায়ও (১৯৭৮-৮০) অপরিবর্তিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে বরাদ্দকৃত আটশ মিলিয়ন টাকার মধ্যে তিনশ একচল্লিশ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকার শতকরা বিয়াল্লিশ ভাগ (৪২%) ব্যয় করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল চার হাজার সাতশ সত্তর মিলিয়ন টাকা, যার পরিমাণ ছিল সমগ্র জাতীয় বাজেটের শতকরা ৪.৩ ভাগ। বরাদ্দকৃত এই অর্থ থেকে দু'হাজার দু'শ বাইশ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ শতকরা ছেচল্লিশ ভাগ (৪৬%) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য নির্ধারিত হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

গত ১৯৮৭/৮৮ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার দু'শ পাঁচটি (৪৪,২০৫)। তন্মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাইত্রিশ হাজার তিনশ একচল্লিশটি (৩৭,৩৪১)। অর্থাৎ শতকরা চুরাশি (৮৪%) ভাগ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয় হাজার আটশ চৌষট্টিটি (৬,৮৬৪) অর্থাৎ শতকরা ষোল (১৬%) ভাগ।

গত ১৯৮৭/৮৮ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার দু'শ পাচটি (৪৪,২০৫)। তন্মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাইত্রিশ হাজার তিনশ একচল্লিশটি (৩৭,৩৪১)। অর্থাৎ শতকরা চুরাশি (৮৪%) ভাগ এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয় হাজার আটশ চৌষট্টিটি (৬,৯৬৪) অর্থাৎ শতকরা ষোল (১৬%) ভাগ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-১৯৯০) সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে "সমন্বিত স্কুল উন্নয়ন" নামে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অত্র পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নতি বিধান এবং প্রকল্পের কার্যক্রম অনুযায়ী দেশে প্রায় এক হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) সরকার কর্তৃক গৃহীত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় "স্কুল উন্নয়ন" প্রকল্পের অসমাপ্ত কর্মসূচীর কাজ সমাপনের প্রচেষ্টা চলে। তাছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে 'জেনারেল এডুকেশন প্রোগ্রাম (GEP)-এর আওতায় দেশের সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় সংস্কার করা,

Dhaka University Institutional Repository

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রতিষ্ঠা, স্যাটেলাইট স্কুল-সাইলট প্রোগ্রামের প্রবর্তন এবং উপানুষ্ঠানিক ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক (CEP) আইন পাশ হয়। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে সারাদেশের কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় এ আইন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। অতপর ১৯৯৪ সাল থেকে সাবাদেশে আইনটি প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ১৪,২৮১.৬৮ মিলিয়ন টাকা কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (ADP) মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়ে তা ২৪,২১৬.৪৮ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। তবে ৪র্থ পরিকল্পনাকালে প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ২০,৩০৭.৪০ মিলিয়ন টাকা। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল মোট শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ৫০-৫২ শতাংশ।(পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা,১৯৯৭-২০০২)[৬]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) দেশে সরকার ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে দশ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২০০২ সালের মধ্যে অর্থাৎ এ পরিকল্পনাকালে সরকার ৭০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জনের প্রত্যাশা করেন। এ লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় সম্প্রদায় এবং মহল্লার (শহরে) সহযোগিতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (CEP) কার্যক্রমকে অধিক কার্যকর করতে চান। সাক্ষরতা অর্জনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাছাড়া দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লাকে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত "Black-Board/Satellite স্কুল এপ্রোচ" শিখন কৌশল অনুসরণ করা হবে। ৫০০ জনের অধিক শিক্ষার্থী থাকলে সে স্কুলে দু'টি শিফট চালুসহ মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (Enrollment rate) ২০০২ সালের মধ্যে প্রায় ১১০ শতাংশে (নীট ৯৫ শতাংশে) উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

এ যাবত বাংলাদেশের শিক্ষা চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দেশে বিভিন্ন ধারার এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে একটি সারণীতে সেটি সংক্ষেপে দেখানো যেতে পারে-

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,১৯৯৮)[৭]

প্রকরণ ও ধরণ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৭১০
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (রেজিস্টার্ড)	১৯,৬৮৪
বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (আনরেজিস্টার্ড)	৩,৯৬৩
হাই স্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক স্কুল	১,৮৮৩
পরীক্ষণ বিদ্যালয় (পিটিআই সংযুক্ত)	৫৩
ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৯,৪৯৯
উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত	২,৭৫৯
কিন্ডারগার্টেন	১,৪৩৪
স্যাটেলাইট বিদ্যালয়	১,০৬১
কমিউনিটি বিদ্যালয়	১,৪১২
এনজিও	১৬,৬৫০
সর্বমোট	১,১২,৭৫৮

উৎসঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মনিটরিং সেল।

৪.৫ প্রশাসনিক আদেশ, ১৯৮৩

১৯৮২ সালে সামরিক সরকারের প্রশাসন পুনর্গঠন ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের উন্নীতকৃত থানাসমূহকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলে উপজেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫ আগস্ট, ১৯৮৩ সালে প্রশাসনিক আদেশ বলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করে। তখন উপজেলা প্রশাসনের অধীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উপজেলা পরিষদে ডেপুটেশনে প্রেরিত হয়। এভাবে একটি উপজেলায় একজন শিক্ষা অফিসার (TEO) ২০০ বিদ্যালয় বিশিষ্ট উপজেলাগুলোতে ১০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ (ATEO) অন্যান্য কর্মচারী প্রেরণ করা হয়। যে উপজেলায় বিশটির কম প্রাথমিক স্কুল থাকবে সেখানে কোন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার না থাকার বিধান রাখা হয়।(GOB Report of the sub committee,1984) [৮]অত্র প্রশাসনিক আদেশে প্রত্যেক উপজেলায় ৯ জন সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এরূপ কমিটির মেয়াদকাল হবে ৩ বছর। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গঠিত এ সব কমিটি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনঃ১৯৯০

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য ১৯৯০ সালে এ আইন পাস করা হয়। এ আইনের প্রথম অংশে জাতীয় প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ সমীচীন বলে মন্তব্য করা হয়। সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যে কোন তারিখ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারবে বলে এ আইনে ঘোষণা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষিত এলাকায়, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত অভিভাবকগণ তাদের শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবশ্যই ভর্তি করাবেন। এ আইনে যুক্তিসঙ্গত কারণ বলতে বোঝানো হয়েছে শিশুর অসুস্থতা, দুই কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে অবস্থিত বিদ্যালয়, আবেদন করা সত্ত্বেও শিশু ভর্তির অপারগতা, শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের হওয়া এবং মানসিক অক্ষমতা।

৪.৭ প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন

ক) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী (Food for Education Programme) (FFEP)

সাধারণভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা উপ-খাতের উন্নয়নের জন্য গত এক দশকের বেশী সময় ('৮০ দশকের শেষ থেকে) ধরে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় সরকারী ও এনজিও-দের মাধ্যমে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দের এক বড় অংশ (উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের মোট শিক্ষাখাতে বরাদ্দের প্রায় ৫০ ভাগ) নিয়মিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা উপ-খাতের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হচ্ছে। ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অনগ্রসর শিশু-কিশোরদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী এনজিওগুলির জন্য সহায়ক বেশ কিছুটা উদার রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক দাতা (যথা-NORAD) ও বহুপাক্ষিক এজেন্সী, যেমন ইউনেসকো, বিশ্বব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি সংস্থাগুলি এই উপ-খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য ও সহজশর্তে ঋণ প্রদান করছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারকগণ উপলব্ধি করছেন যে, আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার নির্বাচিত পরিবারের বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের তালিকাভূক্ত করাতে ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে তাদের অভিভাবকরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। নির্বাচিত পরিবারগুলির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের কৃষি ও কৃষি

Dhaka University Institutional Repository

বহির্ভূত উৎপাদনশীল বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিবর্তে অন্য জাতীয় সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বা অন্য কোন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আয়-সমতা বজায় রেখে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন- 'টার্গেট গ্রুপ' ভিত্তিক শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী যা শুরু হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন FFEP চার বছর পূর্ণ করেছে। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত চারটি অর্থ বছরে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী'র জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় হয়েছে ৭৫৯.৬৪ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন বাজেটে এই কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের শতকরা ১০.৫ ভাগ থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শতকরা ২৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে এই কর্মসূচীর সুবিধাভোগী শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৩-৯৪ এর ৭,০৬,৫১৯ জন (যা মূলধারার বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত হওয়া মোট শিশুর ৫ ভাগ) থেকে ১৯৯৫-৯৬এ ২২,৩৯,৮০৫ জনে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক PMED-এর উন্নয়ন বাজেটে FFEP-এর জন্য বিরাট অংকের বরাদ্দ রয়েছে। কর্মসূচীর নামেই বুঝা যায় 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিতে গ্রামীণ 'টার্গেট' পরিবারগুলির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতির (মাসে কমপক্ষে শতকরা ৮৫ ভাগ) বিনিময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

৪.৮ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features)

FFEP-এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

১. বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় 'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী'র প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এটি বাস্তবায়ন করছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রধানত প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা অর্থাৎ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহায্যে শিক্ষা অফিসার এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রশাসক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে থাকেন।

২. নির্বাচিত ইউনিয়নের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বল্প ব্যয়ের কম্যুনিটি বিদ্যালয় এবং স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রতি ইউনিয়নের সরকার অনুমোদিত একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

৩. কর্মসূচীর আওতায় যে সকল দরিদ্র পরিবারের একটি মাত্র শিশু কর্মসূচীভুক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সে সকল পরিবারকে প্রতি মাসে ১৫ কেজি গম বা ১২ কেজি সমমূল্যের চাউল এবং যে সকল পরিবারের একাধিক শিশু অধ্যয়ন করে সে সকল পরিবারকে প্রতি মাসে ২০ কেজি গম বা ১৯ কেজি চাউল প্রদান করা হয়। এখানে দরিদ্র পরিবার বলতে দু:স্থ বিধবা,

Dhaka University Institutional Repository

দিনমজুর, নিম্ন আয়ের কারিগর যেমন- জেলে, তাঁতী, কুমার, কামার প্রভৃতি এবং প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক বুঝানো হয়েছে।

৪. এই কর্মসূচী নির্বাচিত সুবিধাভোগী পরিবারকে তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য করে। খাদ্য সাহায্য পাবার জন্য সুবিধাভোগী পরিবারের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুকে অবশ্যই বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত হতে হবে এবং প্রতি মাসের মোট কার্যদিবসের শতকরা ৮৫ ভাগ অবশ্যই বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

৫. কর্মসূচীতে খাদ্য সাহায্য পাবার যোগ্য দরিদ্র পরিবার নির্বাচন এবং খাদ্য সহায়তা বিতরণের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি (CPEWC) এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (SMC) যৌথভাবে সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি খাদ্য বিতরণের দায়িত্বে থাকেন। তাদের অপারগতায় ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে খাদ্য বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

৬. বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান যাতে ব্যহত না হয় সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদের খাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের জড়িত করা হয় না।

৭. কর্মসূচীটি আয় ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একটি পরিবারকে প্রতিমাসে ১৫/২০ কেজি গম প্রদান করায় ঐ পরিবারের বাড়তি আয়ের সংস্থান হয়। গম পরিবহন ও বিতরণ কাজে অতিরিক্ত শ্রমিকের চাহিদা সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৮. দরিদ্র পরিবারগুলির শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়নে এই কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যের সংস্থান থাকায় নির্বাচিত সুবিধাভোগী পরিবারগুলির স্বল্প আহার গ্রহণকারী শিশুদের পুষ্টিমানের উন্নতি ঘটছে। এছাড়াও প্রাপ্ত শিক্ষা শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছে।

৪.৯ কিভাবে FFEP-এর সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হয়

"শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"র আওতাধীন প্রতিটি থানার অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ ইউনিয়নকে কর্মসূচীর জন্য নির্বাচন করা হয়। থানা শিক্ষা কমিটি (TEC) তাদের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠালে, তিনি জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয়কারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে প্রতি থানার নির্বাচিতব্য ইউনিয়নসমূহের উল্লেখ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে সুপারিশ করেন। নির্বাচিত থানার/ইউনিয়নের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বল্প ব্যয়ের কম্যুনিটি বিদ্যালয় এবং একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

(যাদের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমপক্ষে ১৫০ জন এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত ৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছে) এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত। সুবিধাভোগী হিসাবে ঐ সব দরিদ্র পরিবারই শুধুমাত্র নির্বাচিত হবে যাদের নিজেদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর আর্থিক সামর্থ্য নেই। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুবিধাভোগী মানদণ্ড হলো-

(ক) পরিবার প্রধান দুঃস্থ মহিলা,

(খ) পরিবার প্রধান দিনমজুর,

(গ) ভূমিহীন/ভূমির পরিমাণ ০.৫০ একরের কম,

(ঘ) অস্বচ্ছল পেশাজীবী যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত বিত্তহীন পরিবার যাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর আর্থিক সঙ্গতি নেই এবং যারা সমমানের অন্য কোন সহায়তা কর্মসূচীতে জড়িত নাই তারাই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এই মানদণ্ড অনুযায়ী স্কুল 'ম্যানেজিং' কমিটি (SMC) এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি যৌথভাবে সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করে।

কর্মসূচীর অগ্রগতি (Progress of Program)

১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রারম্ভিকভাবে ৪৬০টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়নকে কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। ঐ সময়কালে ৪৯১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭,০৬,৫১৯জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর ৫,৪৯,৮৮১টি পরিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে প্রকল্পটি আরও ৫৪০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারিত করার ফলে মোট ১০০০টি ইউনিয়নের ১,৬২৮,৬৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর ১৪,১৬,৯৩২টি দরিদ্র পরিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের আরও সম্প্রসারণ ঘটায় যার ফলে ২৫০টি ইউনিয়নের ১৫,১৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৯,৮৮,৬৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর ১৭,২৯,৫৫৬টি দরিদ্র পরিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এক নজরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর অগ্রগতি

অর্থবছর/ সময়কাল	শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত				
	ইউনিয়ন সংখ্যা	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	সুবিধাভোগী পরিবার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৯৩-৯৪	৪৬০ (১০.৪৪)	৪৯১৪ (৭.৩০)	১৫,০৪,৪৩৭ (১৬.৭৩)	৭,০৬,৫১৯	৫,৪৯,৮৮১
১৯৯৪-৯৫	১০০০ (২২.৭০)	১২,১৮২ (১৮.১০)	৩৬,১৯,২৪৩ (১৯০.৬)	১৬,২৮,৬৫৯	১৪,১৬,৯৩২
১৯৯৫-৯৬	১,২৪৩ (২৮.২১)	১৬,১৫৯ (২৪.০১)	৪৯,৬০,৮১৩ (২৬.৭১)	২২,৩৯,৮০৫	১৯,৬২,৪৯৬

সূত্রঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, ঢাকা, ২মে, ১৯৯৭।

টীকা:

Dhaka University Institutional Repository

১. বন্ধনীর মধ্যে সমগ্র দেশের মোট সংখ্যার শতকরা হার দেখানো হয়েছে।
২. ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে যত সংখ্যায় ইউনিয়ন ও বিদ্যালয় আওতাভুক্ত হয়েছিল, ১৯৯৬-৯৭ সালের জন্য তাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এই সময়কালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অতি সম্প্রতি (২২০২ সন থেকে) 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী' সরকার বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এর পরিবর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের সরাসরি আর্থিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীতে খাদ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী প্রতি মাসে ১০০ টাকা বৃত্তি পাবে। একই পরিবারের দু'জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকলে ১২৫ টাকা প্রতি মাসে বৃদ্ধি পাবে। পরিবর্তিত কর্মসূচীর নামকরণ করা হয়েছে 'শিক্ষার জন্য বৃত্তি'।

৪.১০ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর দক্ষতার উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান লাভ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে-

ক) শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;

খ) কর্মজগতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা;

গ) উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা;

ঘ) শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরের প্রাপ্তমূলক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা;

ঙ) শিক্ষার্থীকে মৌলিক বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান দান।

৪.১১ মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো

বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রচলিত এই শিক্ষা কাঠামোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়-

১। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম	-	নিম্নমাধ্যমিক	-	৩ বছর মেয়াদি
২। নবম থেকে দশম	-	মাধ্যমিক	-	২ বছর মেয়াদি
৩। একাদশ থেকে দ্বাদশ	-	উচ্চ মাধ্যমিক	-	২ বছর মেয়াদি

তবে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন-১৯৭৪ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করে নবম শ্রেণী থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর ঘোষণার সুপারিশ করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক স্তর রয়েছে। সেক্ষেত্রে নবম-দশম শ্রেণীকে দাখিল এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে আলিম পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৪.১২ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও উদ্ভাবন

এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে যে সকল প্রকল্পাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

খ) ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিট্যান্স প্রজেক্ট

গ) মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রকল্প

ঘ) নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প ও নোরাড পরিচালিত নির্ধারিত ৭টি থানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্প

ঙ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের যথাযথ প্রায়োগিক সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা বৃদ্ধি করে ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ। এছাড়া-

ভৌত ও সুবিধাদির উন্নয়ন

এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮৪০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে ১৭৮৭টির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬১৩টির বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৯০৯ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬৮৮টি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হবার কথা।

শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য জেলা শিক্ষা দপ্তরে ও আঞ্চলিক দপ্তরসমূহে ৭২টি গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ সকল গাড়ি, পরিচালকের জন্য জনবল, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের অর্থে সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণ সুবিধাধি সম্প্রসারণের জন্য ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণসহ প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যক্রম পরীক্ষণের জন্য ২২টি গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছে এবং বরিশালে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্পের অধীনে ১৬,৫৬০ জন প্রস্তাবিত শিক্ষকের কার্যকালীন প্রশিক্ষণের মধ্যে ৬,৩৬০ জন এবং প্রস্তাবিত ১২,৫০০ জন বি.এড., ২৪০ জনকে এম.এড. প্রশিক্ষনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ৮,৮১২ জনকে বি,এড. এবং ৪৮১ জনকে এম.এড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ১৮৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুস্তক ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ১১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের সম্প্রসারণেরও উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

২) ছাত্র উপবৃত্তি কার্যক্রম

এ প্রকল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল ছাত্র উপবৃত্তি কার্যক্রম। প্রকল্পাধীন ১০,৯৩,২৪৬ জন ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়ার কার্যক্রমের মধ্যে ১৩,৩৭,৪৫৩ জন ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২,৪৪,১৯৭জন অতিরিক্ত ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে যা ডিসেম্বর '৯৯ সন পর্যন্ত চালু ছিল।

খ) ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট

লক্ষ্য ও কার্যক্রম

বৃত্তি প্রদান, শিক্ষক উন্নয়ন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ উদ্বুদ্ধীকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ব্যবস্থা ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম উন্নয়ন অন্যতম।

এ প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য হল মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ নারী বিধায় এদের শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা এবং আত্মমর্যাদাশীল হিসেবে গড়ে তোলা।

১) ছাত্রীবৃত্তি কার্যক্রম

এ কার্যক্রমের ফলে শিক্ষিত নারী সম্প্রদায় যেমন দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি অন্যতম পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হবে তেমনি সামাজিক সংস্কারে শিক্ষিত মেয়েদের আত্ম-সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পারিবারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে যা সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

প্রকল্পের আওতাধীন ১১৮টি থানায় ছাত্রীদের ষষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণীতে বৃত্তি প্রদানসহ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফি ও পরীক্ষা পর্যন্ত অতিরিক্ত তিন মাসের আর্থিক সহায়তা প্রদান। ১৯৯৭ একাডেমিক বৎসরের হিসেব অনুযায়ী ৮৬৮১২৯ জন ছাত্রীকে উপবৃত্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩০,৭২,০৯,৭৮৩ টাকাবণ্টন করা হয়েছে। (নাইয়ার,৯৮)[৯]

২) শিক্ষক বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বাড়তি শিক্ষক চাহিদা পূরণার্থে প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বেতন-ভাতা প্রদান। শিক্ষক নিয়োগকল্পে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে এবং ১.৪০ রেশিও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগকরণ। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য ২.৭০ মিলিয়ন ডলারের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা রয়েছে (৬৪% সরকারি এর ৩৬% ভাগ অর্থ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার)।

৩) বোনাস স্কীম কার্যক্রম:

বেসরকারি স্কুলে পুরো কার্যাদি পূরণকরণে তাদের ২০% বোনাস স্কীমে ছাত্রীদের অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান করা হয়। ১৯৯৬ সনের পরিবীক্ষণ তথ্যের ভিত্তিতে ১৩৭টি জুনিয়র, ৪১৯টি মাধ্যমিক এবং ২২৬টি মাদ্রাসা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪) প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

প্রকল্পাধীন কেবলমাত্র বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭৪টি। এর মধ্যে সরকারি ২৪টি, মাদ্রাসা ১৭৩টি, সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোট ৩৭৩টি। এর মধ্যে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৫৩৯টি এবং মাদ্রাসা ১২০০টি। সব মিলিয়ে ৪৫১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ৩১৪০টি, মাদ্রাসা ১৩৭৩টি (স্কুলের মধ্যে ৩৩টি সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে) স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এ প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম। বালিকা বিদ্যালয় ও সহশিক্ষা বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পাকা ল্যাট্রিন-এর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। এজন্য ৪.৫ মিলিয়ন ডলার যার ১০০% ভাগই বহিঃসম্পদ থেকে আহরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

গ) মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসরে দেশের ৭টি থানায় সর্বপ্রথম নোরাড অর্থায়নে এফইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে জানুয়ারি মাস থেকে আইডিএ'র অর্থায়নে এফএসএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে ৫৩টি থানায় উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। উপরোক্ত তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় সামাজিক ন্যায়-নীতি এবং সমতাবিধানের লক্ষ্যে দেশের নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের বাকী ২৮২টি থানায় এফএসএস প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এই প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেন।

১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এর কার্যক্রম বাংলাদেশে নারী শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩টি জেলার ২৮২টি থানায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল ও মাদ্রাসা ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২. নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও জনসংখ্যার হার রোধ করা।

৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকহারে নারীদের সম্পৃক্ত করা।

৪. দারিদ্র দূরীকরণে নারীদের স্বকর্মপোযোগী করা।

৫. বাল্যবিবাহ রোধ করা।

৬. নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং

৭. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এই উপবৃত্তি কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৮ সালে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১৯৯১টি। যার মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ১১৬টি, পি.টি.আই ১৭টি, বেসরকারি বিদ্যালয় ৮১০৮টি এবং মাদ্রাসা ৩৭৮৩টি। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্প শুরুর বছরে অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে মোট প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮২২৫টি। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ৯০৬৫, ১৯৯৬ সালে ১০৭৪৮, ১৯৯৭ সালে ১১৪৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পভুক্ত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পটি সরকারের উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং সম্পূর্ন সরকারি অর্থে পরিচালিত সর্ববৃহৎ প্রকল্প যার ব্যয় ৬০৯,১৫,৫৫,০০০/- টাকা। কিন্তু এই কর্মসূচী চালু করার ফলে ছাত্রী সংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বর্তমানে এই প্রকল্পে ব্যয় ৮০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ২৮২টি থানায় ৪৬,১৬১৭০ জন ছাত্রী উপবৃত্তির সুবিধা ভোগ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৯৪ সালে শুধুমাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে (Entry Point) নতুন ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,০৭,০৯৫ জন যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫ সালে ৩,৪৩,৮৬৬ জন, ১৯৯৬ সালে ৪,৩৯,৭৩৩ জন এবং ১৯৯৭ সাল ৪,৭১,৩১০ জন এবং ১৯৯৮ সালে ৫,৫৯,৬০৫ জন অর্থাৎ ১৮% হারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া ১৯৯৪ সালে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪,৫৪,৬৪৫ (ষষ্ঠ-৯ম), ১৯৯৫ সালে ৯,০২,৩৭০ (৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম ও ১০ম), ১৯৯৬ সালে ১৫,০৯,৩১৪ (৬ষ্ঠ-১০ম) ১৯৯৭ সাল ১৭,৬২,৩১৩ এবং ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২১০০,০০০ জন যা থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ২০% ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।(নাইয়ার,পৃ-৪০)[১০]

ঘ) নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবায়ন ও উন্নয়ন

দেশের মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২৭৬০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিষয়টি এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে নির্ধারিত সংখ্যক বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনটি বহুমুখী শ্রেণীকক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ২টি করে পাকা শৌচাগার নির্মাণ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করণার্থে ২টি টিউবওয়েল স্থাপন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অফিসের জন্য যন্ত্রপাতি, বইপুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও শিক্ষার পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন।

জুন/৯৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২৬২টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর মধ্যে ৮৭% প্রতিষ্ঠানে অফিস যন্ত্রপাতি, ৮০% প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র, ৭৪% প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং ১০০% প্রতিষ্ঠানে বই পুস্তক সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ২৭৬০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯২০টি বিদ্যালয়ের প্রোটোটাইপ মডেলে দ্বিতল ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ০.৭৫ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র, ০.৫০ লক্ষ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ০.১৪ লক্ষ টাকার বই পুস্তক, ০.২১ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি ৫ লক্ষ্য টাকার ২টি টিউবওয়েল এবং ০.৫৮ লক্ষ টাকার ২টি শৌচাগার নির্মাণ এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।(নাইয়ার,পু-৪১)[১১]

এছাড়া প্রকল্পাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য ডাটা ব্যাংক তৈরি করণার্থে ৪জন কর্মকর্তা, ১৩ জন কম্পিউটার অপারেটরসহ মোট ১৭জন জনবল রয়েছে। সারাদেশের প্রায় ২৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারিত তথ্য কম্পিউটার সেলে সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং ডাটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মানসম্পন্ন শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। এ শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি শিক্ষক সমাজ। সুতরাং পাঠক্রম, পুস্তকাদি প্রণয়ন ও ভৌত উন্নয়ন যথেষ্ট হবে না যদি না শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের পেশাগত দক্ষতার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মে শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে চলছে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। যেমন-

অ. বিএড প্রোগ্রাম- পাঠক্রম কাঠামো অনুযায়ী ১০ মাসের কার্যক্রমে তিনটি পর্বে বিভক্ত। এর মধ্যে তিন মাসের প্রথম পর্ব তাত্ত্বিক ও ৩ মাসের শেষ পর্ব ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। পঠিত বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয় আবশ্যিক এবং ২টি নৈর্বাচনিক এবং ১টি ঐচ্ছিক টিচিং কোর্স রয়েছে। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির অধিকাংশ সময়ই বক্তৃতামূলক এবং সাথে ব্যবহারিক শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পৃক্ত। এছাড়া দূর শিক্ষণের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২ বৎসরের বি.এড কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ক্ষেত্রে বচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় এবং দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন মূখ্যত মডুলার ভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসৃত ও অবজেকটিভ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

আ. বিএড (সম্মান) প্রোগ্রাম- শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কাঠামোর সংস্কার সাধনই শুধু নয় শিক্ষাকে পৃথক একটি জ্ঞানের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বি.এড (সম্মান) কোর্স চালু করা হয়েছে। এবং ৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এম.এড কোর্সের ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

ই. প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ- প্রধান শিক্ষকদের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এখন একটি জরুরি বিষয়। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ অর্থ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং নতুন নতুন পাঠক্রমের সাথে শিক্ষকদের উপযোগী করে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও এতদসংক্রান্ত তথ্যাদির সংরক্ষণ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের জন্য বি.এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। এছাড়া নায়েমের উদ্যোগে প্রধান শিক্ষকদের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদী শ্রেণী শিক্ষকের উপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মকালীন স্বল্প মেয়াদী ৩ থেকে ৬ সপ্তাহের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৫টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের শিক্ষকদের সংখ্যা ও চাহিদার অনুপাতে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল। বেসরকারি খাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং সরকারি বিদ্যালয়ে নতুন নতুন শিক্ষক নিয়োগে নায়েমের প্রশিক্ষণের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেদিক বিবেচনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহে দুই শিফটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান প্রয়োজনের নিরিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিষ্ঠান পরিচালনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদেরও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকরণার্থে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।

ঈ. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম সংস্কার-** শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে যুগোপযুগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এর ব্যাপক সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৯৮ জুলাই থেকে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের নতুন বি.এড কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ১৯৯৯ জুলাই থেকে নতুন এম.এড কোর্স চালু হয়েছে।

উ. **শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-** মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে মাস্টার ট্রেইনার, ফিল্ড লেবেল ট্রেইনাব, শ্রেণী শিক্ষকসহ ১,৫২,২০৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম ধারা মাদ্রাসা শিক্ষা। প্রায় এক লক্ষ শিক্ষক/কর্মচারী প্রায় ৮ হাজার মাদ্রাসায় কর্মরত। এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশেষ করে আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির তেমন কোন ব্যবস্থা বিদ্যামান ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণার্থের স্বতন্ত্র প্রকল্পের মাধ্যমে স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত কোর্সের মাধ্যমে মাদ্রাসা প্রধানদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

বাংলাদেশে অতীত শতাব্দীগুলোর শিক্ষা চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঐতিহ্যগতভাবে শিক্ষার প্রতি এদেশের মানুষের বিশেষ অনুরাগ রয়েছে। উনিশ শতকের গোড়াতে উলিয়াম এডামের রিপোর্টে এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সন্ধান এবং বেসরকারী উদ্যোগে নানা ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হয়ে যায় সব শিশুর শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন করা। ফলে সরকারের একার পক্ষে তা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে তখন থেকেই দেশে অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে এবং অনেক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাও এগিয়ে আসে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীতে। এভাবে আশির দশক থেকেই বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার (GO-NGO Collaboration) যৌথ অভিযান। বর্তমানে দেশে প্রায় পাঁচ শ'র মত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৯০ এর ফেব্রুয়ারী মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি প্রধান বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সম্মিলিত জোট হিসেবে 'গণসাক্ষরতা অভিযান' নামের একটি সংস্থা যাত্রা শুরু করে। দেশের সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রায় নব্বই শতাংশ পরিচালিত হয় এই জোটের সদস্যদের ব্যবস্থাপনায়।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেসরকারী সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এদের মধ্যে অন্যতম ব্র্যাক, গণসাহায্য সংস্থা, প্রশিকা, আরডি আর এস, এফ, আইডিডিবি, গণশিক্ষা ডানিডা, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন ইত্যাদি। এই সমস্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উদ্যোগে বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়েছে। বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এ ধরণের কিছু উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের নমুনা উল্লেখ করা হল (আলমুতি,১৯৯৬)[১২]

১. **ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমঃ** ব্র্যাকের এই কর্মসূচীতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের এমন সব ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয় যারা আগে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি বা পেলেও অল্পদিনেই ঝরে পড়েছে। এই কর্মসূচী প্রথম থেকে তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর।

২. **গণসাহায্য সংস্থার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীঃ** এখানে যে সব ছেলেমেয়ে নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়নি তাদের ভর্তি করা হয়। প্রথম দিকে শুধু তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছিল; এখন বাড়িয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে। গণসাহায্য সংস্থা সাধারণত স্কুলের জন্য পাকা দালান নিজেরা তৈরী করে।

৩. **বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কারিগরি বিদ্যালয়ঃ** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষা পায়; চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে তাদের বিজ্ঞান, পরিবেশ ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে শেখানো হয়। উদ্দেশ্য হল, ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

৪. **ইউসেপ স্কুলঃ** ৬-১৪ বছর বয়সী খেটে খাওয়া শিশুদের জন্য এই বিশেষ ধরণের স্কুলগুলো চালানো হয়। স্কুলের মেয়াদ সাত বছর। এতে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মিশেল ঘটানো হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয় কেননা এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার তুলনায় গবেষণার সুযোগ অধিক। এভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য এনজিওগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমঃ ব্র্যাক

বাংলাদেশে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাকই প্রথম ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে একটি ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হলেও এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু হয় ১৯৮৫ সালে মাত্র ২২টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল নিয়ে। মাত্র ১০/১১ বছরের মধ্যে তারা (১৯৯৬) সারাদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে সারা দেশে ৫৯টি জেলায় ব্র্যাকের প্রায় ৩৫,০০০ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ব্র্যাক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্মসূচীগুলো পরিচালনা করে।

১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (NFPE)(Nonformal Primary Education)

২. উপানুষ্ঠানিক কিশোর কিশোরী শিক্ষা (BEOC Basic Education for Older Children)

৩. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র (Adult Learning Centre)

Dhaka University Institutional Repository

৪. অব্যবহৃত শিক্ষা (Continuing Education)

১. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্র্যাক

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্র্যাক ১৯৮৫ সালে মাত্র ২২টি স্কুল নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে। ৮-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে যারা আগে আনুষ্ঠানিক স্কুলে যায়নি বা গিয়েও ঝরে পড়েছে তাদের জন্য তিন বছরের কর্মসূচী। ব্র্যাকের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি এই শিক্ষা সমাপ্ত করে এবং প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ব্র্যাক ১৯৯৭ সালে ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর মেয়াদী সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সমপর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী প্রবর্তন করে। এ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ২০০০) ব্র্যাক স্কুল হতে ১.৭ মিলিয়ন শিক্ষার্থী পাশ করে এবং তারা স্কুলের উঁচু শ্রেণীতে ভর্তি হয়(NFPE Phase-3) [১৩] শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হিসেবে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ঃ

১. দেশের গণনিরক্ষরতা কমিয়ে আনা এবং মৌলিক শিক্ষা অর্জনে বিশেষ করে দরিদ্রতম পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভে সহায়তা করা;

২. শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

৩. ব্র্যাক স্কুলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কর্মসূচী সংগঠিত করার কাজে কমিউনিটিকে সংযুক্ত করা;

৪. ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এবং সরকারের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করণে অবদান রাখা;

৫. আধা পেশাগত গুণসম্পন্ন শিক্ষক তৈরী করা;

৬. নৈতিক মূল্যবোধের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা;

৭. জনসংখ্যা পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রমের সাফল্য অর্জনে শিক্ষার সুপ্ত সম্ভাবনাময় শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করা।

১৯৯৯ সন থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্র্যাক তার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া সরকারি সহযোগিতায় ব্র্যাক পোশাক শিল্পের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য ৪৩টি বিদ্যালয়, ৭৩টি কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং ১২০টি বিদ্যালয় For Hard to Reach Children প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে। শুরু থেকেই ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী মডেলের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. লক্ষ্যদলঃ ৮ থেকে ১০ বছরের শিশু যারা কখনও আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি কিংবা ঝরে পড়েছে;

২. শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৩ জন;

৩. এক কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে সুবিধামত সময়ে নির্ধারিত;

৪. এক স্কুল একজন শিক্ষিকা;

৫. তিন বছর মেয়াদী বিদ্যালয় তবে ১৯৯৭ সন থেকে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত চালু রয়েছে।

৬. বিনা পয়সায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ। উল্লেখ ১৯৯৯ (Phase-II) থেকে সামান্য ফি প্রদান ব্যবস্থা চালূ করা হয়েছে।

এভাবে ব্র্যাক তার অভিজ্ঞতা ও সফলতার পথ ধরে দেশের সাংবিধানিক দায়িত্ব সকলের জন্য সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষায় অবদান রেখে সুদীপ্ত পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে।

২. উপানুষ্ঠানিক কিশোর কিশোরী শিক্ষা

১৯৮৮ সাল থেকে ব্র্যাক ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনে কিশোর কিশোরী বিদ্যালয় চালু করে। তিনবছর মেয়াদী এ সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা হয়। এই স্কুলগুলোও ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে। ১৯৮৭ সালে যখন ব্র্যাকে কিশোরী স্কুল চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন এর নাম ছিল Primary Education for Older Children (PEOC) কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে Basic Education for Older Children (BEOC) বলা হয়। এ স্কুলের লক্ষ্যদল দু'টিঃ

ক. ১১-১৪ বছরের মেয়েদের যারা কখনও স্কুলে যায়নি

খ. যারা আনুষ্ঠানিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ে আর কখনও স্কুলে যায় না।

কিশোর-কিশোরী স্কুলের শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে ৭০% ভাগ মেয়ে হতে হবে। ১৯৯৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্র্যাক তার ৯,১২৮ কিশোরী স্কুলে ২,৭৭,২২৩ জন ছাত্রী পড়াশোনায় অন্তর্ভুক্ত রেখেছিল। যেহেতু এ ধরণের স্কুলে কিশোরী অধিক সংখ্যক সে কারণে এ ধরণের স্কুলকে কিশোরী স্কুল বলা হয়। কিশোরী স্কুলে মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজন যেমন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এসব স্কুলে NFPE স্কুলের মত শিখন সামগ্রী বিনা পয়সায় দেয়া হয় এবং কোন ফি নেই। তবে ব্র্যাক Phase-II (১৯৯৯) থেকে BEOC শিক্ষার্থীদের জন্য ও সামান্য ফি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে।

ব্র্যাক কিশোরী স্কুলকে কেন্দ্র করে ১৯৯৩ সাল থেকে কিশোরী পাঠকেন্দ্র চালু করেছে। সেখানে এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষার্থী যারা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে অথবা ভর্তি হয় নি তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের পুস্তকাদি রাখা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, অনেক বিবাহিতা কিশোরী ও এক সন্তানের জননী এ পাঠকেন্দ্রের সদস্য এবং তারা অব্যাহত শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে।(আলমুতী,১৯৯৬)[১৪]

৩. বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

ব্র্যাক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় ১৯৮৭ সালে দেশের কয়েকটি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে বয়স্কদের সাক্ষরতার জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার নিজে এ কর্মসূচী এককভাবে পরিচালনা করেন এবং ব্র্যাক তার নিজস্ব বিভিন্ন কারণে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র কর্মসূচী বাতিল করে দেয়।

৪. অব্যাহত শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম নব্যসাক্ষরদের জন্য এবং একটি শিখন সমাজ গঠনে (Learning Society) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। ব্র্যাক ১৯৯৫ সাল থেকে তার এনএফপিই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রামীণ নাগরিকদের পড়ার অভ্যাস (Reading Habit) গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অব্যহত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। ব্র্যাকের অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে দুই ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ক. কিশোরী পাঠকেন্দ্রঃ ব্র্যাকের কিশোরী স্কুল সমূহের মধ্যে যেগুলো তাদের নির্দিষ্ট সময় সফলভাবে শেষ করেছে সেই সমস্ত স্কুলে ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে কিশোরী পাঠকেন্দ্র।

খ. গণকেন্দ্র ইউনিয়ন পাঠাগারঃ কোন একটি ইউনিয়নের চাহিদার ভিত্তিতে ঐ এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষের আর্থিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় গণকেন্দ্র ইউনিয়ন পাঠাগার। সাধারণত একটি হাইস্কুল ভবনের লাইব্রেরীতে নির্ধারিত সদস্য ফি প্রদানের প্রেক্ষিতে একজন লাইব্রেরীয়ানের তত্ত্বাবধানে এ ধরণের পাঠাগার তার কার্যক্রম চালায়। (অব্যাহত শিক্ষা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)।

১৯৯৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্র্যাক অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে ৬,১৫১টি কিশোরী পাঠকেন্দ্র এবং ৪০০টি ইউনিয়ন পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী

বিগত তিন দশকে বেসরকারী সংস্থা গুলোর (এনজিও) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে এটি প্রমানিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সর্বজনীন সাক্ষরতা ও শিক্ষা অর্জনে বেসরকারী উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা আজ

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত রূপ নিয়েছে। বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন হতে দেখা যায় সাধারণভাবে এসব কার্যক্রমের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

ক. সনাতন ধারার শিক্ষাক্রমের তুলনায় এদের শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ;

খ. শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি উদ্ভাবন মূলক;

গ. বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি মনোরম ও আকর্ষণীয়;

ঘ. সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সমর্থন বেশি হওয়ায় উপস্থিতি ও সমাপ্তির হার বেশি;

ঙ. প্রায়শ সাক্ষরতা কর্মসূচী আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বেশি ফলদায়ক;

চ. সাধারণত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় সময়সূচী অনুসরণ করা হয়;

ছ. মেয়েদের বেশি হারে উপস্থিতি দেখা যায়; এবং

জ. প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পৃথক আলোচনা করতে গেলে কলেবর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। সে কারণে সার্বিকভাবে বেসরকারী সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার আলোকপাতের প্রচেষ্টায় যুক্তিসঙ্গত। পর্যালোচার ভিত্তিতে দেখা যায়, বেসরকারী সংস্থাগুলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নানা ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে প্রধানত দ'টি ধারায় ভাগ করা যায়ঃ

১. সম্প্রসারণ কার্যক্রম
২. সহায়তা কার্যক্রম

১. সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ সম্প্রসারণ কার্যক্রম শিশুদের, কিশোর-কিশোরীদের বা বয়স্কদের জন্য হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনটি বয়ঃগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ক. শিশু সাক্ষরতা (৪-১০+)
খ. কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা (১১-১৫) ও
গ. বয়স্ক সাক্ষরতা (১৫-৪৫+)

ক. শিশু সাক্ষরতাঃ এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা ধরণের কর্মসূচী রয়েছে। যেমন: ১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী। এর মেয়াদ সাধারণত ৬-১২ মাস। আনন্দদায়ক খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা শিশু সাক্ষরতার সহায়ক হিসেবে শিশুর বিকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে নিম্নে তার একটি তালিকা দেয়া হলো (হামিদ,২০০১)[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী	কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান	কার্যক্রম
১। শিশুর দৈহিক বিকাশ ভিত্তিক কর্মসূচী ০-২ বছর (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগ থেকে সুরক্ষা)	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র মা ও শিশুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রীক বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ক্লিনিক	দৈহিক পরিমাপ, টিকা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, মায়ের গর্ভকালীন যত্ন ও সেবা, শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, সম্পূরক/সুষম খাদ্য (৬ মাস থেকে), আয়োডিন ঘাটতি জনিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কমবৃদ্ধি ইত্যাদি।
২। শিশুর সার্বিক ভিত্তিক কর্মসূচী ০-৫ বছর (দৈহিক, আবেগিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃদ্ধির বিকাশ)	হোম, শিশুপল্লী, এতিমখানা।	পরিবারকেন্দ্রিক প্রথাগত শিশুর যত্ন ও শিক্ষণমূলক কার্যাবলী, পরিকল্পিত-প্রধানত দৈহিক যত্ন, নিরাপত্ত ও পূর্ব -প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম।
৩। শিশুর দৈহিক বিকাশভিত্তিক কর্মসূচী ২-৫ বছর (স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগ থেকে সুরক্ষা)	শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লিনিক, হোম, হাসপাতাল, এতিমখানা।	পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ (নিউমোনিয়া), ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রন, নিরাপদ পানি, ভিটামিন-এ ও আয়োডিন ঘাটতিজনিত রোগ প্রতিরোধ।
৪। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ভিত্তিক কর্মসূচী ৩-৪ বছর ৪-৫ বছর।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী, নার্সারী, কিন্ডার গার্টেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শিশুপল্লী, হোম, এতিমখানা।	পূর্বপ্রস্তুতি শৈশবকালীন শিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড।
৫। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ কার্যক্রম ৬-৭ বছর।	প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণী, বেসরকারি স্কুলের প্রথম শ্রেণী, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, হোম, শিশু পল্লী, এতিমখানা, মক্তব, মাদ্রাসা।	পড়ালেখা, হিসাবের দক্ষতা, পরিবেশ জ্ঞান, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।
৬। শিখন দক্ষতা (Learning skills) ও জীবন যাপনের দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী, গঠনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম ৭-৮ বছর।	সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণী, শিশুপল্লী, হোম, এতিমখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি।	পড়া, লেখা, হিসাবের দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, আচরণ, সুঅভ্যাস, সামাজিকতা, দায়িত্ববোধ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।
৭। শিখন দক্ষতা (Learning skills) ও জীবন যাপনের দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী, গঠনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম ৮-৯ বছর।	সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণী, শিশুপল্লী, হোম, এতিমখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি।	পড়া, লেখা, হিসাবের দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, আচরণ, সুঅভ্যাস, সামাজিকতা, দায়িত্ববোধ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।
৭। শিখন দক্ষতা (Learning skills) ও জীবন যাপনের দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী, গঠনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম।	সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের দ্বিতীয়/তৃতীয় শ্রেণী, শিশুপল্লী, হোম, এতিমখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি।	পড়া, লেখা, হিসাবের দক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা, আচরণ, সুঅভ্যাস, সামাজিকতা, দায়িত্ববোধ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা: ১. প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীঃ এ ধরণের শিক্ষার মেয়াদ দু'বছর। ছ'সাত বছরের শিশুদের এই শিক্ষা শেষে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি সংস্থার এ জাতীয় কর্মসূচী রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রথম-তৃতীয় শ্রেণী (৬-৮ বছর)ঃ যেসব শিশু প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাননি তাদের ভর্তি করা হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ শিশুরা নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। এফআইভিভিবি, গণসাহায্য সংস্থা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রভৃতি সংস্থার এ জাতীয় কর্মসূচী রয়েছে।

৩. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রথম-তৃতীয় শ্রেণী (৮-১০ বছর)ঃ নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি বা ভর্তি হয়ে গোড়াতেই ঝরে পড়েছে এমন আট বছর বয়সী শিশুদের ভর্তি করা হয়। তিন বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। ব্র্যাক, প্রশিকা, আরডিআরএস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- এসব সংস্থার এ ধরণের কর্মসূচী রয়েছে।

৪. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা- প্রথম-পঞ্চম শ্রেণীঃ মূল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান্তরাল পুরো পাঁচ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম রয়েছে কারিতাস, জিএসএস, আরডিআরএস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থার। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই ৬-১০ বছর।

৫. প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষাঃ কোনো কোনো উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের মৌলিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে বুনিয়াদি শিক্ষার পর তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে প্রযুক্তি কেন্দ্রের ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরো দৃষ্টান্ত হল ইউসেপ পরিচালিত প্রথম-অষ্টম শ্রেণীর এবং টিডিএইচ-এর প্রথম-পঞ্চম শ্রেণীর নৈপুণ্যবিকাশী কর্মসূচী।

খ. কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতাঃ এই কার্যক্রমের আওতায় নানা ধরণের কর্মসূচী রয়েছে।

১. **যেমন উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী কার্যক্রমঃ** সংস্থাভেদে ১১ তেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য দু'বছরের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। এই শিক্ষাক্রমের শেষে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের দক্ষতা অর্জন করে।

২. **বিবাহযোগ্য বালিকা শিক্ষাক্রমঃ** এই শিক্ষাক্রমে ১৫-১৭ বছর বয়সী বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। আরডিআরএস এ ধরণের কর্মসূচী পরিচালনা করে।

৩. **স্বাস্থ্য সাক্ষরতা কার্যক্রমঃ** ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১৫-২০ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য এই কর্মসূচী চালু হয়েছে। এতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। হাতে নাতে শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্তত তিন বছর স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম: স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর শিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম অংশ হল বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম: তার সময়সীমা সংস্থাভেদে ৩-১২ মাস। মেয়েদের তারতম্য অনুসারে বয়স্কদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাতেও ভিন্নতা ঘটে। সাধারণত ১৫-৩৫ বছর বয়সের নারী-পুরুষ এসব কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কার্যক্রমের ব্যয় মূলত আয়োজক সংস্থাই বহন করে। কোথাও কোথাও (যেমন প্রশিকায়) গণসংগঠনগুলো সদস্যদের উপকরণ ব্যয়ের দায়িত্ব নেয়; অন্যান্য ব্যয়ের দায়িত্ব আয়োজন সংস্থার। সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ সম্পূর্ণভাবে নারীদের দ্বারা পরিচালিত নারীকেন্দ্রিক বিষয়ে বিশেষ ধরণের সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনা করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অন্যান্য কিছু সংস্থা নারীদের জন্য সাক্ষরতার পাশাপাশি নানা ধরণের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিছু সংস্থা সবাসরি সাক্ষরতা শিক্ষার বদলে বয়স্কদের জন্য সচেতনতা সঞ্চারমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করে; যেমন ব্র্যাক, জিএসএস, আরডিআরএস প্রভৃতি।

সহায়তা কার্যক্রম: সম্প্রসারণ কার্যক্রম ছাড়া বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর দ্বিতীয় প্রধান দিক হল সহায়তা কার্যক্রম। এসব কার্যক্রম নানামুখী যথা:

১. শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন: কিছু বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বুনিয়াদি শিক্ষার উপকরণ (প্রাইমার বা শিক্ষার্থী সহায়িকা, চার্ট, ফিচার কার্ড, পোস্টার ইত্যাদি) এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করে। কোন কোন সংস্থা উন্নত মানের সাক্ষরতা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে (ব্র্যাক, আরডিআরএস, এফআইবিডিবি, জিএসএস, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন)। কিছু সংস্থা করেছে শিশু শিক্ষার উপকরণ (ব্র্যাক, জিএসএস ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন), আবার কিছু করেছে কিশোর-কিশোরী শিক্ষার ও অণুসারক শিক্ষা উপকরণ (ব্র্যাক, এফআইডিডিবি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ভি ই আর সি)।

২. সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ সহায়তা: অনেক স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা সাক্ষরতা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। তারা নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিজ সংস্থা এবং অন্য সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালায়। এরকম সংস্থার সংখ্যা পঞ্চমের ওপরে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা দেড় শ'র কাছাকাছি। যেসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কর্মী প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান কর্মী প্রশিক্ষণ, কারিগরী কর্মী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

৩. উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম: সাক্ষরতা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্থাগুলোকে শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করাই এর উদ্দেশ্য। গণসাক্ষরতা অভিযান, এফআইডিডিবি প্রভৃতির এ জাতীয় কর্মসূচী আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আর্থিক, কারিগরী, ব্যক্তিগত ও অব্যাহত শিক্ষা সহায়তা: কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অন্যান্য স্থানীয় বা তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বা বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে; ব্র্যাক প্রভৃতি সংস্থা সাক্ষরতার সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অর্জন বা মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কারিগরী সাহায্য দেয়; বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি (বেইস) সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বা শিক্ষা ঋণ দেয়; আবার কোন কোন সংস্থা সাক্ষরতা কর্মসূচীর ফলাফলকে ধরে রাখা ও পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচী শুরু করেছে।(আলমুতী,১৯৯৬)[১৬]

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ: গণসাক্ষরতা অভিযান-এর দৃষ্টি থেকে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতি সম্বন্ধে জরিপ চালিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর ব্র্যাক প্রথম সাক্ষরতা উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এ ধরণের উদ্যোগ নিতে আরম্ভ করে। এখন প্রায় ত্রিশটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা সাক্ষরতা উপকরণ তৈরি করছে। বয়স্কদের জন্য বিশেষ কার্যকর উপকরণ তৈরি করেছে ব্র্যাক, আরডিআরএস, এফআইভিডিবি, গণশিক্ষা-ডানিডা, জিএসএস, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমও বয়স্কদের জন্য কিছু উপকরণ তৈরী করেছে। এসব উপকরণ ৬-১২ মাস সময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা

১.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণপকার, শিক্ষা,সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে ১৯৭৮, পৃ-২৩.

২.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ-৬২।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন,১৯৯৭,পৃ পৃ-৪১-৪২।
৪.প্রাগুক্ত,১৯৭৪,পৃ-২৩।

৫. প্রাগুক্ত,১৯৯৭,পৃ-৪৩।

৬ .Fifth Five Year Plan (1997-2002), Chapter XX, Review of Fourth Five Year Plan, page-427.

৭ .Directorate of Primary Education (DPE), Monitoring Cell, June 1998.

৮ . GoB,*Report of the sub committee to determine the mechanism for* deputation of the officials belonging to the transformed subjects to the Upazilla Parishad,cabinet Division,Dhaka,1984 ,p-8

৯.প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা,মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান ও ভবিষৎ,জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ,৯৮,প্রতিবেদন,শিক্ষা মন্ত্রনালয়,পৃ-৩৮।

১০.প্রাগুক্ত,পৃ-৪০

১১.প্রাগুক্ত,পৃ-৩৮

১২.আযদুলল্লাহ আল মুতী, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯২-৯৩.

১৩.NFPE phase-3(2000,Annual report,BRAC,Dhaka-2000)

১৪.প্রাগুক্ত,১৯৯৬

১৫.আবু হামিদ লতিফ, বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬।

১৬.আবদুল্লাহ আল মুতী, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী; পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়-বাংলাদেশে সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী;পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা

৫.১ পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা

পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা সময়ে সময়ে উন্নত করা হয়েছে এবং কয়েক বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। নীতিমালা পরিবর্তনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সমবণ্টন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, বাজার অর্থনীতির সুবিধা ভোগ, কর্মসূচীসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতা, স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করা। ২০০১ সালে সরকার জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বাত্মক পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা পেশ করেছে। নীতিমালায় বলা হয় যে, সরকার যেখানে উন্নয়নের সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করবে সেখানে জনগণ তাদের উন্নয়নের ধারক ও বাহক হবে। নীতিমালায় মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর, জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ এবং নারী উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পারস্পরিক সমর্থনমূলক কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয় এবং সকল এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টার স্ট্রেটেজির পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, একটি দুই বছরের পরিকল্পনা এবং PRSP-I প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। ২০০৮ সালে PRSP-I শেষ হওয়ার পর ২০০৮ সালের জুলাইয়ে PRSP-II চালু করা হয়েছে।

এই ডকুমেন্টারিটির প্রকৃত নাম হলো- Unlocking the potential : national strategy for accelerated poverty reduction. বর্ধিত দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে PRSP তে দেশের সার্বিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। MDG এর সাথে মিল রেখে নীতিমালার লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতির সহজাত সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। PRSP-I এ দরিদ্রদের কৃষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নকে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Moving ahead: national strategy for accelerated poverty redction II, নামক দ্বিতীয় NSAPR তৈরি করা হয়েছে এবং অর্থ বছর ৯ থেকে ১১ সালের মধ্যে বর্ধিত দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতিমালা ও স্ট্রেটেজি গ্রহণ করা হয়েছে। NSAPR-এর ভিশন কেন্দ্রীয় অবস্থানে জনগণকে রাখা হয়েছে। এই স্ট্রেটেজিতে প্রাইভেট সেক্টর উন্নয়ন, সরকারী প্রচেষ্টা, দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজে এনজিও ও সিভিল সমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

মান উন্নয়ন, অন্যান্য সেবা প্রদান এবং জীবন বান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন সাধন। এর আরও লক্ষ্য হলো মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা, জেন্ডার সমতা অর্জন ও আঞ্চলিক ভারসাম্য এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো রক্ষা করা। এটি জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে এবং কম্যুনিটির দরিদ্রতর অংশের আয়ের বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করে।

৫.২ প্রধান প্রধান পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী: এখানে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যেসব উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে তা আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৩ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল্যায়ন: বর্তমান বাংলাদেশে গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (AID) কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে সর্বাত্মক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী চালু হয়। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য ছিল গ্রামবাসীদের উৎপাদনমূলক ফল ও প্রকৃত আয় ত্বরান্বিত করা, বৃদ্ধি করা, পল্লী এলাকায় প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ বহুমুখী করা এবং নিজ নিজ পদক্ষেপ গ্রহণ, গ্রামবাসীদের মধ্যে নেতৃত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, গ্রামবাসীদের বর্ধিত সেবা প্রদান এবং সরকারের পুরো প্রশাসনিক কাঠামোর কল্যাণমূলক ভিত্তি রচনা করা। কিন্তু এই কমূসূচী ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসেই বন্ধ হয়ে যায়। যদি V-AID সরকারী বিভাগগুলোর সমন্বয় সাধন এবং পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়, তবুও এরই একটা ধারা চলতে থাকে যা রূপ নেয় বাংলাদেশের IRD তে।

V-AID সহ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশাসনের জন্য ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গবেষণা ও এ্যাকশন গবেষণা ট্রেনিং কর্মসূচীকে অধিক কার্যকর করার জন্য যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে IRD মডেলের উদ্ভবের পেছনে এই একাডেমীর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পল্লী উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ন বাধা দূর করতে এই মডেল সক্ষম হয়েছে। এই বাধাগুলো হলো (১) কার্যকর প্রশাসনিক অবকাঠামোর অভাব (২) পর্যাপ্ত শারিরীক অবকাঠামোর অভাব (৩) সাংগঠনিক অবকাঠামোর অভাব। একাডেমীর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের যে মডেলটির বিকাশ ঘটে তা কুমিল্লা মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটি প্রশাসনের সুবিধাদানের বিকেন্দ্রীকরনে থানা প্রশিক্ষন ও উন্নয়ন কেন্দ্র সরকারী এজেন্সীগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রশিক্ষন ও সেবা সমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন। পল্লী পোতাশ্রয়, খাল খনন, রাস্তা, কালভার্ট তৈরি

Dhaka University Institutional Repository

কম্যুনিটি বিল্ডিং ইত্যাদি তৃতীয়ত হলো থানা সেচ কর্মসূচী (৪) চতুর্থত থানা লেভেলে গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সংস্থা এবং তাদের সংঘের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যাবস্থা (KSSTCCA)।

RWP, TTDC & TIP মডেলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ষাটের দশকে সারাদেশে প্রতিফলিত হয়েছিল। (KSSTCCA) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (IRDP) নামে সারাদেশে ১৯৭২ সালে প্রতিফলিত হয়। IRDP এর প্রথম স্কিমে (১৯৭০-৭৩) এর দ্বিতীয় স্কিমে (১৯৭৩-৭৮) যেসব উদ্দেশ্য ছিল তা হলো-

(১) মানব সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহার এবং উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বস্তুগত সম্পদের কুমিল্লার অণুরূপ সমবায় সংস্থা গঠন।

(২) কৃষকের নিজস্ব মূলধনের সঞ্চয় এবং ক্রয় শেয়ার করা।

(৩) প্রাথমিক সমবায় সংস্থার মাধ্যমে আয়োজিত এবং তত্ত্বাবধায়নকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ঋনি ও ইনপুটের সার্থক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৪) নতুন নতুন ধ্যান ধারণা ও জ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে যথাযথ কৃষি উদ্যোগের অগ্রগতি সাধন।

(৫) গোষ্ঠী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিত করা।

(৬) উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সফল সরবরাহ ও সেবার সমন্বয় সাধন।

(৭) অবিরাম প্রশিক্ষন এবং গোষ্ঠী কাজের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ।

(৮) সদস্যদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক আয় বন্টনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ।

(৯) সর্বাত্বক পল্লী উন্নয়নের জন্য আলোচনা, পরীক্ষন ও পরিকল্পনা।

এখন আমরা কয়েকটি বড় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করবো-

দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, আয় এবং দরিদ্র হ্রাস করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অসংখ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্রদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একই সময়ে তাদের ক্ষমতায়ন এবং সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিগুলো দারিদ্র দূরীকরনের বিভিন্ন কমূসূচী পালন করেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভিজিডি কর্মসূচী, পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষনের ফলে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মতো শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী বিশেষ বৃত্তি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা খরচের ব্যাপক হ্রাস করছে। সমাজ কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু অধিকারের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যা

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্রদের উন্নত জীবন যাপনে ব্যাপক সহযোগিতা করছে। সাম্প্রতিককালে সরকার পল্লী দারিদ্র হ্রাস করার জন্য ১০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সরকারী সংগঠনসহ অসংখ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পল্লী উন্নয়নের জন্য কাজ করা, পল্লী উন্নয়নের জন্য কর্মরত কিছু কিছু এনজিও হলো ব্রাক, আশা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, প্রশিকা, টিএমএসএস, শক্তি ফাউন্ডেশন, সোসাইটি ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট, ব্যুরো ইত্যাদি। গ্রামীণ ব্যাংক ও পল্লী সহায়ক কেন্দ্রের মতো কিছু বিশেষায়িত ক্ষুদ্র অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান আছে যারা দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর বর্ণনা নীচে দেওয়া হলো।

৫.৪ সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামস

সেফটি নেট কে সংজ্ঞায়িত করা যায় কার্যাবলী, নীতিমালা ও কনসূচীর হিসাবে যা সরাসরি দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার চেষ্টা করে। এটি নূন্যতম আয় এর সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করে। বাংলাদেশ সরকার হতদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কিছু কর্মসূচী নিয়েছে সেগুলো হলো- বয়স্কভাতা কর্মসূচী বিধান ও হতভাগাদের জন্য ভাতা কর্মসূচী, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী কর্মসূচী ও প্রশিক্ষন ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী, এসিড দগ্ধ ও শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ জনগণের জন্য অর্থ তহবিল গঠন, প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি কর্মসূচী এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী। সাম্প্রতিককালে সরকার সুবিধাভোগীদের পরিমান বৃদ্ধি করেছে। পাশাপাশি সরকার দারিদ্র হ্রাসের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাড়িয়েছে সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের বিস্তৃত করার জন্য।

৫.৫ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী: সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীনে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতা ও সুবিদা ভোগীর সংখ্যা ২০০ টাকায় ও ১৬ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৩৮৪০ মিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২৮৮০ মিলিয়ন ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বন্টন করা হয়েছে।

৫.৬ বিধবা, ডিজার্টেড ও হতভাগা নারীদের জন্য ভাতা কর্মসূচী এই কর্মসূচীর অধীনে বিধবাদের ভাতা দেওয়া হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মাসিক ভাতার হার ২০০৪ সালের ১৬৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয় এবং সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ২০০৪ সালের ৬ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬.৫ লাখে করা হয়। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ১৫৬০ মিলিয়ন টাকা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ১১৭০ মিলিয়ন টাকা ২০০৭ সালের মার্চের মধ্যে সুবিধাভোগীদের মধ্যেবন্টন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৭ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসূচী: অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য সম্মানী, প্রশিক্ষন ও আত্মকর্মসংস্থানের কর্মসূচী রয়েছে। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ এবং মাসিক ভাতার হার ২০০৬-০৭ সালে ছিল ৫০০ টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৬০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং এই অর্থের ৩০০ মিলিয়ন টাকা ২০০৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরন করা হয়। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য প্রশিক্ষন ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর অধীনে ৬৪টি জেলা থেকে ৪৫৫১৭ সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা হয় এবং ২০০৬-০৭ সালে কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টার্গেট গ্রুপের সব সদস্যকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য টার্গেট গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত সদস্যদের আত্ম কর্মসংস্থান অর্থ যোগান দিতে ক্ষুদ্র ঋণের সরবরাহ করা হয়।

৫.৮ এসিড দগ্ধ নারী ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং পুনর্বাসন: বাংলাদেশ সরকার এসিড দগ্ধ নারী এবং শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গদের পুনর্বাসনের জন্য একটা ফান্ড চালু করেছে যাতে হতভাগা নারীদের দুঃখ মোচন হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১০০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে ।প্রত্যেক এসিড দগ্ধ নারী ও শারীরিক বিকলাঙ্গদের জন্য। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে, সরকার ১০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দিচ্ছে। ২০০৭ সালের মে পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন টাকা মাঠ পর্যায়েবণ্টন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্টাইপেন্ড প্রকল্প (PRSP) এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো দরিদ্র পরিবারগুলোর স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন। এ প্রকল্পে অধীনে, দরিদ্র সন্তানদের দৈনন্দিন উপস্থিতি ও রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ৫.৫ মিলিয়নের ও অধিক দরিদ্র ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পায়। অধিকন্তু, reaching out of school children নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যার পরিমান ৫০০০ মিলিয়ন টাকা। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন।

৫.৯ নারীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতা কর্মসূচী: মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আত্ম কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক বয়সের নীচে বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীর অধীনে, স্টাইপেন্ড এর আকারে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনামূল্যে শিক্ষাক্রম, বই ভাতা ও পরীক্ষার ফি নারী শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় এই শর্তে যে তারা উপস্থিতি, পরীক্ষা ও বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের কিছু শর্ত থাকবে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে স্টাইপেন্ড এর সংখ্যা ১০১ হাজার বেড়েছে।

৫.১০ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচী: গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সহযোগিত কর্মসূচীটি হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (FWP), বিপন্ন গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচী VGD, VGF এবং TR কর্মসূচী। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো (১) দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুম (২) পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন।

৫.১১ দারিদ্র বিমোচনের বিশেষ কর্মসূচীসমূহ: এ প্রোগ্রামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হলো (১) দারিদ্র বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্প (২) পোল্ট্রি মুরগী ও গবাদিপশু খাতে অর্থনৈতিক সহযোগিত প্রদান (৩) দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (৪) গৃহহীনদের গৃহায়নের জন্য ফান্ড তৈরি (৫) বেকার তরুনদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কর্মসূচী (৬) দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসনের জন্য আবাসন প্রকল্প (৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঝুকি হ্রাসের জন্য ফান্ড (৮) অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবেলার কর্মসূচী এবং (৯) হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ফান্ড।

৫.১২ দারিদ্র হ্রাসের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীসমূহ: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী বাংলাদেশে সাফল্যজনকভাবে পরীক্ষা করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ্রামীণ বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী থেকে লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশে এই উদ্দীপনামূলক কর্মসূচীর সাফল্য একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ সম্পদ তৈরি, আয় উপার্জনের ব্যবস্থা এবং দরিদ্রদের আয়ের ধাক্কা সামলাতে একটি কার্যকরী টুল হিসাবে প্রমানিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণের উৎস্যসমূহকে দুটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস্যের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, সমবায়, এনজিও ও সবকারী এজেন্সী এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস্যের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়স্বজন, আত্মীয়স্বজন নয়, অর্থলগ্নীকারী ও অন্যান্যরা। সকল উৎসের মধ্যে পরিবারগুলোতে ঋণবন্টনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের অংশ সবচেয়ে বেশি (২২%), এনজিও-

Dhaka University Institutional Repository

দের ২১ শতাংশ। ব্যাংক থেকে ঋণের অংশ ১৩ শতাংশ, অন্যদিকে অনাত্মীয়দের প্রদত্ত ঋণের পরিমান ১২ শতাংশ।

৫.১৩ ক্ষুদ্র ঋণের প্রধান প্রধান এনজিও ও বিশেষায়িত সংগঠনগুলোর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ

বাংলাদেশের এনজিওগুলো রিলিফ ও পুনর্বাসন এজেন্সী হিসেবে ১৯৭০ এর দশকে কাজ করত। ১৯৮০-এর দশকে তারা উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হয়। তাদের কর্মসূচীগুলো দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। তাদের কর্মসূচীসমূহের মধ্যে রয়েছে দরিদ্রদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান তৈরি সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন, দক্ষতার বিকাশ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ।

এনজিওগুলো সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা বন্যা, খরা, অতি বৃষ্টি ও মারাত্মক ঠান্ডায় আক্রান্ত লোকদের সহযোগিতা করছে। ঋণ ও উন্নয়ন ফোরাম (CDF) এর পরিসংখ্যান অণুসারে, ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। এ সময়ে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৬.৪ মিলিয়ন, তাদের মধ্যে ১২ শতাংশ পুরুষ এবং বাকী ৮৮ শতাংশ নারী। এই সময়ে সদস্যদের মধ্যে সমযোজিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমান ৪, ৩১, ২৩০৫ মিলিয়ন।

৫.১৪ গ্রামীণ ব্যাংক: গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে ইহার কর্মকাণ্ড শুরু করে। সহায় সম্বলহীন লোকদের সংগঠিত করে এবং তাদেরকে আয় বাড়ানো পুজি বৃদ্ধি ও সম্পদ নির্মাণের জন্য ঋণ সহযোগিত দিয়ে। গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো (১) এটি ভূমিহীনদের জন্য collatcral মুক্ত ঋণ দেয়।

(২) ৫ সদস্যের দল গঠন করা হয় (৩) সাপ্তাহিক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে সদস্যরা অবশ্যই কিছু পরিমান অর্থ জমা করবে (৪) সাপ্তাহিক ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে ঋণগুলো সংগ্রহ করা হয়। (৫) নন-ফরমাল কর্মকাণ্ডের জন্য লোন দেওয়া হয় (৬) গ্রামীণ স্টাফরা এই কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান করে (আলমগীর ১৯৯৭)। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এটির কর্মকাণ্ড ৭.০১ মিলিয়ন সদস্যে পৌছেছে। তাদের মধ্যে ৬.৭৭ মিলিয়ন নারী এবং ০.২৪ মিলিয়ন পুরুষ। ৩১৪৪৮২.৭ মিলিয়ন টাকা ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৫ ব্র্যাক: ব্রাক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারী ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা। ১৯৭২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও এই সংগঠনটি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। ব্রাক ২০০৬ সাল পর্যন্ত ২০৮৪০৯.২ মিলিয়ন টাকাবন্টন করেছিল এবং ১৮৪২৫২.৫ টাকা তুলেছিল। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫.৩১ মিলিয়ন তাদের মধ্যে ৫.১৪ মিলিয়ন হলো নারী এবং ০.১৭ মিলিয়ন হলো পুরুষ (আর্থ মন্ত্রণালয় ২০০৭) ব্রাকের ক্ষুদ্র অর্থ ঋণ কর্মসূচীর গুরুত্বপূণ্ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বিভিন্ন মর্যাদার দরিদ্র ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান (২) এর সদস্যদের সামনে ও পিছনে উভয় ধরনের লিংকেজ প্রদান (৩) ব্র্যাক সদস্য ও তাদের পরিবারগুলোতে বিশেষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রদান, সদস্যদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও সচেতনতা তৈরির জন্য প্রশিক্ষন প্রদান। সদস্য ও তার পরিবারগুলোর জন্য মানবাধিকার ও আইনগত সেবা প্রদান। ব্রাকের ক্ষুদ্র অর্থ কর্মসূচীর ব্যাপক প্রভাব হলো (১) ব্র্যাক সদস্য পরিবারগুলোর দ্বিগুন সেভিংস অন্যান্য পরিবারগুলোর চেয়ে। (২) গড় অর্থ ১৭০০ ক্যালরি ভোগ এবং মোট খাদ্য ও non-food ব্যায়গুলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্র্যাক সদস্য পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে অত্যাধিক বেশী। (৩) ব্র্যাক সদস্য পরিবারগুলো নীট আয় ব্রাক সদস্য নয় এরূপ পরিবারগুলোর চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশী। (৪) ব্র্যাক সদস্যরা বিশেষভাবে সম্ভ্রান্ত তাদের থাকার স্থানের দৃষ্টিকোন থেকে (৫) ব্রাক ঋনের ৫০ শতাংশ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ব্যবহার করা হয় (চৌধুরী ২০০৭)।

৫.১৬ আশা: আশা একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন হিসাবে ১৯৭৮ সালের মে মাসে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। তাদের কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দরিদ্রদের জন্য সচেতনতা তৈরি এবং দলীয় সংগঠন। আশা পরবর্তীতে তাদের স্ট্রেটেজি পরিবর্তন করে দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিবেচনা করে। বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হিসেবে আশা ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ সংগঠন। ক্ষুদ্র ঋণ সংগঠনগুলোর মধ্যে আশা সবচেয়ে নিম্ন খরচে তাদের কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে।

৫.১৭ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF): পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য হলো পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং দরিদ্র্য ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এই ফাউন্ডেশনটি ২৮টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় তাদের কর্মকান্ড সম্পাদন করছে যা বাংলাদেশের এক তৃতীয় এলাকা জুড়ে। প্রায় ৯৫ শতাংশ সুবিধাভোগী হলো নারী। এই ফাউন্ডেশন ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৮১০৭.৯ মিলিয়ন টাকাবন্টন করে। এছাড়াও সুবিধাভোগীদের সেবিংস ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং রিকভারী হার ৯৪ শতাংশ ফাইন্ডেশনের লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাত্মক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (CVDP) দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কুমিল্লার বার্ড সর্বাত্মক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর শিরোনামে একটি নূতন পল্লী উন্নয়ন মডেল উন্নয়ন ঘটিয়েছে। CVDP এর উদ্দেশ্য হলো আত্ম-কর্মসংস্থান তৈরি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। বাংলাদেশ সরকার এই মডেলটি গ্রহণ করেছে এবং ২০০৫ সাল থেকে দেশের সমগ্র পল্লী এলাকাগুলোতে প্রতিফলিত করছে। বর্তমানে বার্ড, আরডিএ, বিআরডিপি ও সহযোগী বিভাগগুলোর মাধ্যমে ১৮ জেলার ২১ টি উপজেলার ১৫০০ গ্রামে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। CVDP এর প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো সদস্যদের সাপ্তাহিক মিটিংয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচী তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেচ প্রকল্পে অবদান রেখেছে। প্রথম বাস্তবায়ন কর্মসূচীতে সম্পন্ন হবে ২০০৯ সালের জুনে। জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় বাস্তবায়ন প্রকল্পের কাজ ৫৯টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ২০০৯ সালের জুনে শুরু হবে।

৫.১৮ পল্লী উন্নয়নের বিবেচ্য বিষয় ও স্ট্রেটিজেসমূহ: অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতাসহ সহস্রাব্দ উন্নয়নের কয়েকটি টার্গেট ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। জাতীয় দারিদ্র্য লাইনের নীচে জনগণের অন্যান্য টার্গেট অর্জনে দেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সার্বজনীন প্রাথমিক স্কুলের ভর্তির লক্ষ্য অর্জন করেছে, ৫ বছর বয়সের নীচের শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করে। এটি আরো মৌলিক মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর বিশেষ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০০৪ সালের মধ্যে এটি মাঝারি ধরনের মানব উন্নয়ন দেশে উন্নীত হয়েছে। এই অর্জনগুলো সম্ভব হয়েছে কারণ বাংলাদেশ সব কিছু তার উন্নয়ন স্ট্রেটেজির মধ্যে দারিদ্র হ্রাসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উপরোক্ত সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতার সাফল্য এটি টেকসই করার জন্য চলমান সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন। দেশ এখনও বয়স্ক সাক্ষরতার হার, নিরাপদ পানি ব্যবহার, মাত্রকালীন মৃত্যু হার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপন হার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে রাজনীতি ও মজুরী কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ কাংখিত লেভেল থেকে অনেক পেছনে রয়েছে। অণুরূপভাবে, প্রয়োজনীয় ওষুধ, টেলিযোগাযোগ সেবা এবং ইন্টারনেট এবং কম্পিউটারের সেবা প্রদানে দেশ এখনো বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

NSARD-II এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রধান ধারার কর্মসংস্থানে একটা স্ট্রেটেজি রয়েছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষন কর্মসূচী বৃদ্ধি করতে হবে। অসংগঠিত খাতে শ্রমিকদের দক্ষতার উন্নয়নে, প্রশিক্ষনের মেয়াদ এবং প্রশিক্ষন কোর্সের স্থান

Dhaka University Institutional Repository

চালূ করতে হবে। দরিদ্র ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনেক দরিদ্র লোক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তদানুসারে, সেফটি নেট কর্মসূচীর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, উন্নয়নের আঞ্চলিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে, নারীর অগ্রগতি ও অধিকারের উপর জোর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পরিবেশগত রক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে, মানব সম্পদ তৈরি করা হচ্ছে, বাস্তবায়নকে শিক্তিশালী করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ এর পল্লী নন-ফার্ম কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫.১৯ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

জীবনের গুনগত মানের উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা খাতে অধিক জোর দিয়েছেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অনুসারে, বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। একারণে বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্টাইপেন্ড কর্মসূচী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে নারীদের স্টাইপেন্ড কর্মসূচী, নগরের ছেলে মেয়েদের জন্য মৌলিক শিক্ষা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি বৃদ্ধি। শিক্ষকদের রেজিস্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য জাতীয় কমিশন গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ, পারফরম্যান্স ভিত্তিক -এর স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়নের সূচনা। এই অধ্যায়ে পরিবর্তনসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা সাক্ষরতা হারে ঘটেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ভর্তির হারেও লক্ষ্য করা যায়।

৫.২০ সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনঃ যে ব্যক্তির বয়স ৭ কিংবা তার বেশী এবং যিনি একটি চিঠি লিখতে পারেন তাকেই অক্ষরজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করা যায়। এই সংজ্ঞা অণুসারে, জাতীয় পর্যায়ে ৫২ শতাংশ জনগণ অক্ষরজ্ঞান সমৃদ্ধ, যার মধ্যে ৫৬ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৮ শতাংশ নারী ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী। এথেকে বোঝা যায় যে, নারী অক্ষরজ্ঞানের হার প্রায় ৮ শতাংশ যা একই বছরে পুরুষদের চেয়ে কম।

জাতীয় পর্যায়ে সাক্ষরতার হার ১৯৯৫ সালে ৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৫২ শতাংশে দাড়ায়। প্রতিবার গড় ১.৩ শতাংশ সাক্ষরতার হারের ব্যাপক প্রবনতা পল্লী এলাকার চেয়ে নগর এলাকায় অধিক সফলতর। ফলে, পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হার ১৯৯৫ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে অনেক কমে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২১ বিদ্যালয়ে প্রকৃত ভর্তির হারে পরিবর্তন: বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ভবিষ্যৎ সাক্ষরতার লেভেলে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের ভর্তির এবং এগুলো উচ্চ লেভেল পর্যন্ত বলবৎ নিশ্চিত করা না যায়, তবে এটি শিক্ষার উচ্চতর লেভেল এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে পারবে না। এখানে নীট প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বিবেচনা করা হয়েছে। নটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারকে মোট জনসংখ্যার একই বয়সকে ১০০ দ্বারা গুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তিকৃত ৬-১০ বছর বয়সী জনসংখ্যার হারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে নটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের অনুপাত হিসাবে।

বাংলাদেশ বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বৃহৎ সংখ্যক মেয়ে ভর্তি সরকারের পদক্ষেপের ফল- মহিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্টাইপেন্ড (এফএসএস) কর্মসূচী যা ১৯৯৪ সালে উদ্বোধন হয়। এফএসএস কর্মসূচীর আওতায় সরকারী পারিবারিক ব্যয় বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ বহন করার আওতায় নিয়ে এসেছে। স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয় সরাসরিভাবে নিকটবর্তী কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নামে আলাদা একাউন্টের মাধ্যমে। স্টাইপেন্ড গ্রহী ছাত্রীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের খরচ বহন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

এফএসএস কর্মসূচীতে টিউশান সহযোগিতা প্রদান করা হয়, যদিও অর্থনৈতিক সহযোগিতার এই অংশে বিদ্যালয়কে প্রদান করা হয় যেখানে বালিকারা ভর্তি হয়। এই কর্মসূচী ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করেছে বিদ্যালয়ে ব্যাপক হারে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ২০০০ সালে ৭৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে প্রায় ৮০ শতাংশে দাড়িয়েছে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে। এখানে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা কৌতুহলউদ্দীপক যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার পুরুষদের তুলনায় কিছুটা বেশী। কিন্তু এক দশকের হিসাবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। এটি ঘটার কারণ মূলত সরকারেব নারী স্টাইপেন্ড-এর প্রভাব।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল জাতীয় পর্যায়ে ৭০ শতাংশ এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৬৬ শতাংশ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৭৪ শতাংশ। এই হারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েব হারের চেয়ে কম। এটি এই নির্দেশ করে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় ১০ শতাংশ তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

করার পর মাধ্যমিক বিদ্রালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারে না। গ্রাম ও পল্লী উভয় এলাকায় ভর্তির ব্যাপক হার লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য দূর করার ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে। এফএসএস কর্মসূচী নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সফল হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে যখন বাংলাদেশ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ (শ্রীলংকা বাদে) নারী পুরুষের ক্ষেত্রে সমতা অর্জন করেছে।

অধিকন্তু, সাম্প্রতিককালে, নারীদের ভর্তির হার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেভেলে পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। এটি একটি দেশের জন্য আকর্ষণীয় অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলোচ্য গ্রাম দুটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যাবস্থা, নারী শিক্ষার অবস্থা ও পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়-আলোচ্য গ্রাম দুটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষা ব্যাবস্থা নারী শিক্ষার অবস্থা ও পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

৬.১ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

-দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশকেও বিশ্বস্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে দেখা হয়। গ্রামাঞ্চলে পুরুষেরা খেত-খামারে কাজ করে এবং প্রায় নির্বিঘ্নে চলাফেরা করে কিন্তু নারীরা ঘরের কাজে আবদ্ধ। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও সীমিত। তারপরও সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান শিল্প খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার বেড়েছে এবং বিদ্যালয়গামী মেয়েদের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু এগুলোর সাথে সাথে কি নারীর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে?

৬.২ সামাজিক অবস্থানের নির্ধারকসমূহ: এই বিশ্লেষণটি দুই ধরণের প্রশ্নের উপর গুরুত্বারোপ করে। প্রথম প্রশ্নটি নারীদের গৃহের বাইরে স্বাধীনভাবে/স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা নিয়ে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি নারীদের পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের এখতিয়ার বিষয়ে।

বেশিরভাগ নারী গৃহাভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে কিন্তু এর বাইরে তাদের চলাফেরা সীমিত রাখার প্রবণতা দেখা যায়। প্রায় এক-চতুর্থাংশ নারী কদাচিৎ অথবা কখনোই তাদের গ্রামের বাইরে বের হয়নি। যখন তারা তাদের গ্রামের বাইরে যায়, খুব কম সংখ্যকই বোরখা পরিধান করে কিন্তু প্রায় অর্ধেক তাদের স্বামী বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের সাথে যায়।

পরিবারের আয়-ব্যয় বা অন্যান্য বিষয়ে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা খুবই কম। এর মধ্যে তাদের নিজেদের এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের মত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত। তিন-চতুর্থাংশ নারীর নিজেদের অসুস্থতা বা বাচ্চার অসুস্থতায় ডাক্তার দেখানো বা ঔষধ কেনার ব্যাপারে অল্প মতামত আছে অথবা মোটেই নেই। পরিবারের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে খুব অল্পসংখ্যক নারীর শক্ত মতামত আছে। এমনকি এক-তৃতীয়াংশ নারীর তাদের নিজেদের উপার্জনকৃত অর্থ কীভাবে খরচ করা হবে সে বিষয়ে দৃঢ় মতামত নেই।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা বিধিনিষেধ/নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়ে প্রতিটি মহিলাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। মাত্র অর্ধেক নারী বলেছে যে, তারা পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে যাওয়ার অনুমতি পায়। তারপরও খুব কম সংখ্যক নারী মনে করে যে তারা ঘরের বাইরে চলচ্চিত্র বা উৎসব-অনুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দিতে পারে অথবা উপার্জন করতে পারে । প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মতে, তারা তাদের অসুস্থ শিশুকে গ্রামের বাইরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে তাও শুধুমাত্র জরুরী অবস্থায় অথবা প্রায় মৃত অবস্থায়।

৬.৩ কী কী বৈশিষ্ট্য নারীদের সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করে?

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গ্রাম্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে নারীদের চলাফেরা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এই বিশ্লেষণে তা নিরূপণ করে। অনেকগুলো ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় যেমন নারীর বয়স ও শিক্ষা এবং তার পরিবারের আর্থ সামাজিক অবস্থা। পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক স্থানীয় নিয়ম-কানুন এবং আচার-আচরণের বিষয়টিও বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জরিপে উঠে এসেছে। এই বিষয়গুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিবেচনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৬.৪ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ: গৃহের আয়তন, জমির পরিমাণ এবং স্বামীর পেশা, এর সবগুলোই গতিশীলতার পরিমাপক। এগুলো একত্রে নির্দেশ করে যে অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের নারীরা গরীব পরিবারের নারীদের তুলনায় কম গতিশীল। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে ধনী পরিবারের নারীরা অনেক ঝঞ্ঝামুক্ত, যেখানে দারিদ্রতা নারীদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে যেতে বাধ্য করে।

প্রত্যাশার বিপরীতে একজন নারীর শিক্ষারও তার চলাফেরা/গতিশীলতার উপর জোরালো নেতিবাচক ভূমিকা আছে এবং তার স্বামীর শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব আরও বেশি। নারীদের আচরণ, শিক্ষা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিগুলোকে পরিবর্তনের চেয়ে বরং সমর্থন করে যেমনটা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হিন্দু নারীদের চেয়ে মুসলমান নারীদের চলাফেরা কম কিন্তু অন্য বিষয়গুলো বিবেচনা করলে ধর্মের স্বতন্ত্র প্রভাব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অঞ্চলের তারতম্য নারীদের চলাফেরায় সবথেকে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

৬.৫ পল্লী নারীদের প্রোফাইল: উত্তর দাতাদের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাদের গড় বয়স ৩৪ বছর এবং বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সামান্য অবস্থা এখানে পরিলক্ষিত হয় মাত্র ৩ বছর। যা তাদের নিম্ন মর্যাদার অন্যতম কারণ। নারীরা গড়ে ৪টি সন্তানের জননী, হয়তো পুত্র সন্তান লাভের আশায় এটি ঘটেছে। অধিকাংশ নারীই গৃহে থাকে, এই পরিবারগুলো ৬জন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত। পারিবারিক খামারের গড় এরিয়া ০.৭০ হেক্টর খামার গৃহের সদস্যরা খামার ও খামার বিহীন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে এবং গড়ে ৬৫০০০ টাকা আয় করে বাৎসরিকভাবে যা তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় আমরা বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার সদর থানার দুটো গ্রাম খাইলকৈর এবং গাছা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। খাইলকৈর গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৮০,০০০ যেখানে ৫২ শতাংশ নারী এবং ৪৮ শতাংশ পুরুষ,শিক্ষার হার ৯৫শতাংশ যার মধ্যে নারী ৮০ শতাংশ এবং পুরুষ ২০ শতাংশ।গাছা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১৫০০০। নারীর সংখ্যা ৪৮ শতাংশ এবং পুরুষের সংখ্যা ৫২ শতাংশ।শিক্ষার হার ৬৫ শতাংশ যার মধ্যে নারী ৪৫ শতাংশ এবং পুরুষ ৫৫ শতাংশ।বর্তমান। উভয় গ্রামের জনসংখ্যার পেশা কৃষি। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো এ গ্রাম দুটোতেও ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হয় এবং আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ভূমির উপর চাপ একটা বড় বিবেচ্য বিষয়। অল্প কয়েকটি পরিবারই কৃষির উপর নির্ভর করে। মজুরী শ্রমিকরা কৃষি ও অকৃষির সমন্বয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

গত দুই দশকে গ্রাম দুটিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও নারীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের গ্রাম অনুযায়ী দুটো গ্রামেই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাদি পাওয়া যায়। খাইলকৈর গ্রামটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে। গাছা গ্রামটি ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হলেও সেখানে ইউনিয়ন ভিত্তিক পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র আছে। দুটো গ্রামের কনস্ট্রেকটিত ব্যবহারের পরিমান অনেক বেশি, ৬০ শতাংশেরও বেশি বলে মনে করা হয়। যা জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশী। গ্রাম দুটোতে শিক্ষার ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যাবস্থা রয়েছে।

এটি প্রতীয়মান হয় যে, কয়েকটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কর্মকাণ্ডের ফলে এসব গ্রামে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ৫০ শতাংশ পরিবার ১৯৯৫ সালে চারটি উন্নয়ন সংগঠনের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯২ সালে এনজিও সদস্য পদ ছিল অনেক কম। যদিও সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দারিদ্র্য দূরীকরণ কিংবা সামগ্রিক উন্নয়নেব উপর এনজিও কর্মসূচীর অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে , তবুও গ্রামগুলিতে তাদের অপরিহার্য সামাজিক প্রভাব রয়েছে যা শিশুদের শিক্ষার প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করছে। এসব সংগঠন দারিদ্র্য, জেন্ডার অসমতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এনজিও-র ঋণ সহায়তা গ্রামীণ অর্থনীতির মুদ্রা প্রবাহ বৃদ্ধি ও নিয়মিত করেছে।

এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও দুটো গ্রামে অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যবাহী গ্রামের অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। লিঙ্গ শ্রম বিভাজনের ফলে শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ খুব কম । পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃতান্ত্রিকই রয়ে গেছে । একটি নব্য ও শোষণমূলক বিবাহ, কনের পরিবারের উপর যৌতুক দাবি, এসবই কিশোরী বালিকাদের জন্য সম্পর্কগত প্রভাব ।

যদিও প্রত্যেকটি গ্রামেই এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তবুও অতীতে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল কেবলমাত্র এলিটদের এবং গুটিকয়েক পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। ফলে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার অনেক কম এবং এটি নারীদের ক্ষেত্রেও সত্য। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন গ্রামগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক শিক্ষার আলোকে দেখতে হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা: আমাদের আলোচ্য গবেষণার গ্রাম দুটি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ থেকে ৫ জন শিক্ষক রয়েছে। বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হয় এবং বিদ্যালয়ে কোন ফিস দিতে হয় না। বৎসরের শুরুতে যৎসামান্য পরীক্ষায় ফি ও অন্যান্য বিষয়ের ফি সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ড্রেস কিংবা ইউনিফর্ম নাই। যদিও শিশুরা ৬ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তবুও এই বয়সটা বেধে দেওয়া হয়নি। শিশুরা যে কোন জায়গায় ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে।

গাছা গ্রামে একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে কিন্তু খাইলকৈর গ্রামের নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলো প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে থানা সদর দপ্তরে অবস্থিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বালিকাদের জন্য ফ্রি, কিন্তু ছেলেদেরকে টাকা দিতে হয়, ছাত্রদের বই কিনতে হয়, ভর্তি ও পরীক্ষার ফি ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই দিতে হয়। দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মতো, এসব বিদ্যালয়ের ড্রেস কোর্স আছে এবং ইনিনিফর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। সব ছাত্র-ছাত্রী ১০ ও ১২ গ্রেড শেষে পরীক্ষা দিতে বসে।

পাঠদানের ভাষা বাংলা। শুরুতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী পড়ানো হয় এবং মাধ্যমিক লেভেলে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা রয়েছে। তৃতীয় গ্রেড থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী গ্রেডে উন্নীত হওয়ার জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় অবশ্যই পাশ করবে। কিন্তু ব্যর্থ হলে সেই একই ক্লাসে আবার থাকতে হয়।

শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার বাড়লেও, খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সফল হচ্ছে। স্কুল-বয়সী ছেলেমেয়েদের অনেকেই স্কুলে ভর্তি হয়নি তাদের গ্রেড অনুযায়ী। যাইহোক, বয়স-নির্ভর গ্রেডের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বর্তমান আলোচ্য গ্রাম দুটোতে ।আলোচ্য গ্রামদুটোর বিদ্যালয়গুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, গ্রেডে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারন রয়েছে। ১১৫২ শিশুর জরিপে ১২ শতাংশই ছেলেমেয়ে বয়স অনুসারে যথাযথ গ্রেডে

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন করছে। যেসব ছেলেমেয়ে তাদের বয়স অনুসারে গ্রেডে পড়ছে না, তাদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ বিদ্যালয়ে যায় না। অন্যদিকে বয়সের তুলনায় যারা নিম্ন গ্রেডে পড়ছে তাদের ৬৫ শতাংশই অন্ত তঃপক্ষে ১ বছর একটি ক্লাসে থাকছে এবং ৩৫ শতাংশ স্কুলে প্রবেশে বিলম্বের কারণে বয়সের তুলনায় গ্রেডে পিছিয়ে পড়ছে।

তরুন বয়সীদের তুলনায় বয়স্ক গোষ্ঠীদের মধ্যে অনুরূপ উচ্চ হারের ধরন বাংলাদেশের অন্যান্য ভর্তির তথ্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন ১৯৮১ সালে সমগ্র পল্লী ছেলেমেয়েদের জন্য জাতীয় আদম শুমারী তথ্য। ১৯৯২ সালে বয়স-ভিত্তিক ভর্তির হার বেশী বলে প্রতীয়মান হয়। দেরীতে ভর্তির ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেছে। ৬-৯ বছরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির লেভেল ১০-১৬ বছর বয়সীদের কাছাকাছি, কেননা শিশুরা বহুলাংশে তরুন বয়সে বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে। উভয় গ্রামে বালিকাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার হার অনেক কমে গেছে এবং 'গাছা' গ্রামে বালকদের বিদ্যালয়ের হার কমে গেছে বলে মনে হয়। ' খাইলকৈর ' গ্রামের বালকেরা একমাত্র দল বলে মনে হয় যেখানে দেরীতে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ঘটনা লক্ষ্যনীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়নি। ৬-১২ বছর বয়সীদের ভর্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সত্বেও ' খাইলকৈর ' গ্রামের বালকদের মধ্যে একমাত্র শিশু যারা কোন incentive কর্মসূচীর লক্ষ্যবস্তু নয়, তাই এটি মনে হয় যে জনগণের মধ্যে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রাথমিক বয়সে স্কুল শুরু করার ব্যাপক প্রবনতায় এই কর্মসূচী বিশেষ অবদান রেখেছে।

সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে বালিকারা বালকদের চেয়ে বেশী একই গ্রেডে থেকেছে, এই পার্থক্য ' খাইলকৈর ' গ্রামে অনেক কম। ' খাইলকৈর ' গ্রামের পিতামাতারা তাদের কন্যাদের জন্য গ্রেডের অগ্রগতির উৎসাহিত করতে শুরু করেছে, যাতে তারা বৃত্তির সুবিধা পায়। এই তথ্যে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তিকর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বালিকাদের অগ্রগতির জন্য একটি incentive হিসাবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

গাছা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা

বিদ্যালয়ে মেয়েদের যেতে নানাবিধ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়।কৃষিপ্রধান পরিবার হওয়ায় সাংসারিক বিভিন্ন কাজকর্মে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হয়।গ্রামের পরিবারগুলো অধিকাংশ দরিদ্য হওয়ায় বাবা মা তাদের মেয়ে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহ বোধ করেন না।এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক কারন। বর্তমান গবেষণায় আমরা দুটো গ্রামের ৬০ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।উওরদাতাদের ৪৭ শতাংশ পুরুষ বিদ্যালয়ের দুরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন,অন্যদিকে মাত্র ৩৬ শতাংশ নারী এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।এক্ষেত্রে রক্ষনশীল মানসিকতার বিষয়টি আনেক কমে গেছে। নারী পুরুষ উভয়ের উত্তরের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।তবে রাস্তায় বখাটে ছেলেদের উত্তক্ত করার বিষয়ে দুটো গ্রামের নারী পুরুষ একমত হয়েছেন যে,বিদ্যালয়ে নারীরা এখন নিরাপদে যেতে পারে না।

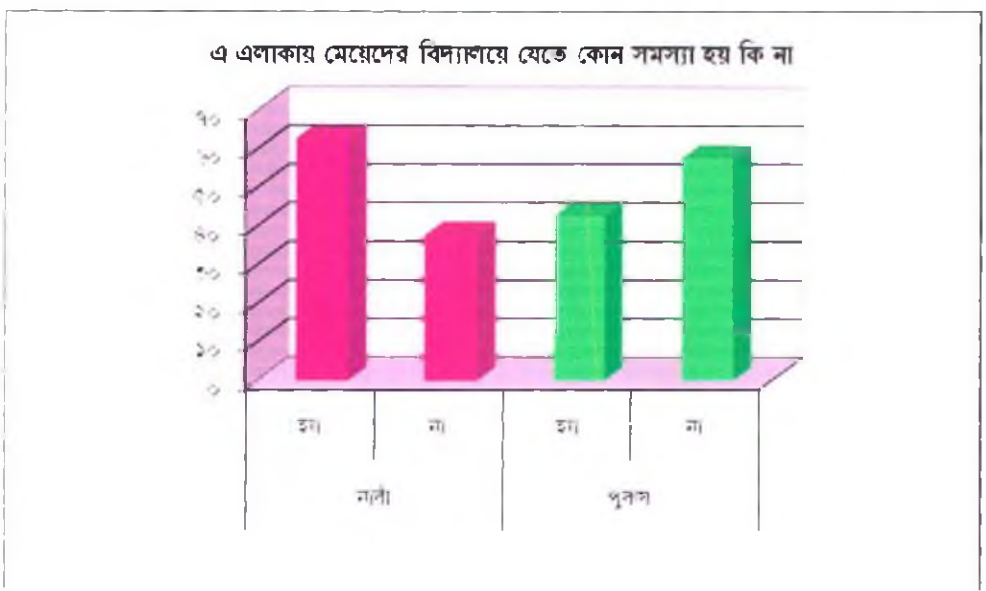

Dhaka University Institutional Repository

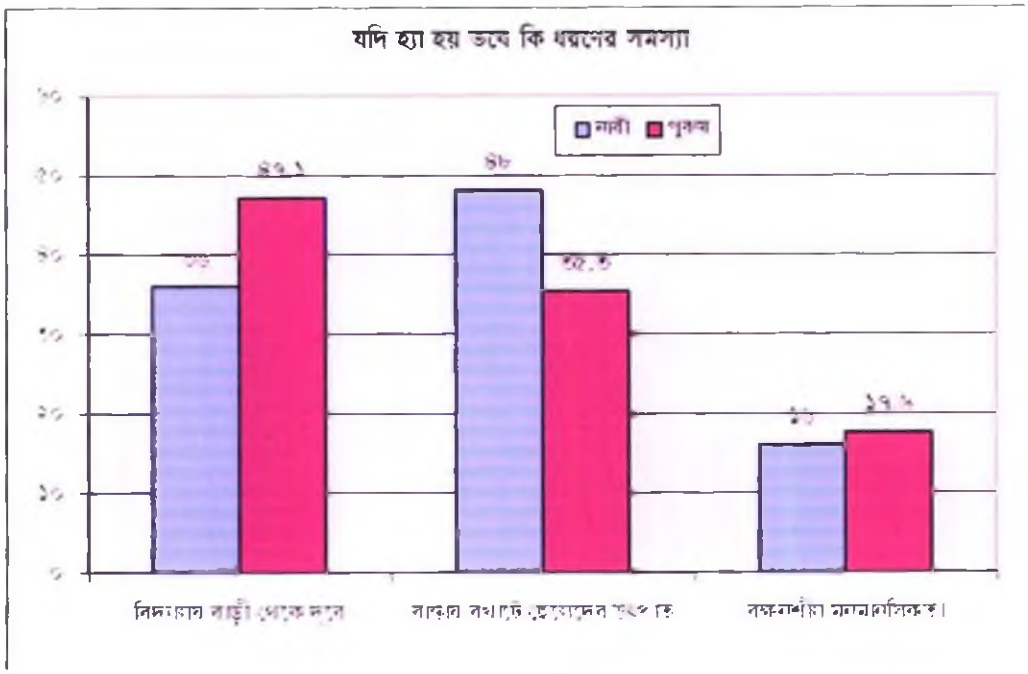

Dhaka University Institutional Repository

খাইলকৈর গ্রামের শিক্ষাদানরত এক নারী

Dhaka University Institutional Repository

খাইলকৈর ও গাছা গ্রামে বিদ্যালয়গামী মেয়েদের ঝরে পড়ার কারন

খুব কম অভিভাবকই আছে যারা তাঁদের মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করতে আগ্রহী। তাছাড়া অধিকাংশ অভিভাবকদের মতে মেয়েদের বেশি পড়ালেখা করিয়ে লাভ নেই। বিয়ে হলে তারা পরের ঘরে চলে যাবে। মা-বাবা বৃদ্ধ হলে দেখবে না। মেয়েদের এসএসসি পর্যন্ত পড়ানোকে তারা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তারা তাদের মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন শুধু মেয়েরা উপবৃত্তি পাচ্ছে বলে। কারণ এই উপবৃত্তির টাকা তাদের সংসারেই কাজে লাগে।

একটি মেয়ে মেধাবী হলেও সে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে না। অপরপক্ষে একটি ছেলে সাধারণ ছাত্র হলেও তাকে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে তার অভিভাবক। কারণ পুত্র সন্তানের কাছে তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা খুঁজে পান, যা মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে ভাবেন না।বর্তমান গবেষণায় ৫৩.৩ শতাংশ নারী অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা বলেছেন,৩১.৭ শতাংশ গৃহকাজে সময় দেওয়াকে কারন হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং ১৫ শতাংশ নারী ঝরেপরার ব্যাপারে নিজেদেরকে দায়ী করেছেন।অন্যদিকে পুরুষ উওরদাতাদের ৪২ শতাংশ নারীদের গৃহকাজে অন্তভুক্ত থাকাকে দায়ী করেছেন যা নারী অভিমত থেকে ব্যাপক পার্থক্য ।আমাদের আলোচ্য গ্রাম দুটোতে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীর মধ্যে ঝরে পড়ার সংখ্যা নারীদের ক্ষেত্রে ৮.৩ শতাংশ এবং পুরুষদের ১৫ শতাংশ।৩য় থেকে ৫ ম শ্রেণীর মধ্যে ঝরে পরার সংখ্যা ২০ শতাংশ যা নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমান।৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেনীর মধ্যে ঝড়ে পরা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে অনেকটা বেশী। নারীরা ৩৫ শতাংশ এবং পুরুষরা ৩০ শতাংশ। ৯ম থেকে ১০ম শ্রেণীর মধ্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সামান্য মাত্র ১.৭ শতাংশ বেশী নারী ঝরে পড়ে।

449250

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

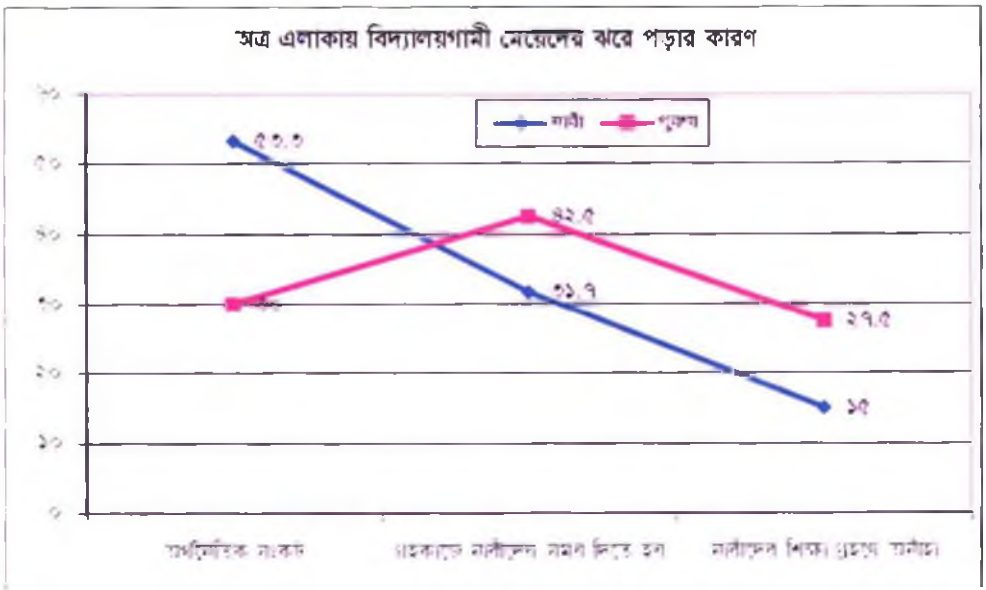

কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার

বাংলাদেশের সমাজ একটি ঐতিহ্যবাহী সমাজ। অনেক আগে থেকেই নারীরা তাদের স্বশিক্ষার মাধ্যমে নিজগৃহে বসে নানা ধরনের ব্যাবহার্য সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র যেমন বেত দিয়ে ধামা ঝুড়ি,খেজুড়ের পাটি,ইত্যাদি তৈরি করতো।বর্তমানে এসব কর্মকান্ডকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষা নামে একটি শিক্ষা চালু করলেও তা সর্বত্র প্রসার লাভ করতে পারেনি।শহর এলাকায় এটির প্রসার লক্ষ্য করা গেলেও গ্রাম এলাকায় এটি তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি।বর্তমান গবেষণায় এরূপ একটা প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতারা পল্লী এলাকায় অধিক হারে কর্মমুখী প্রতিষ্ঠান নির্মানের উপর গুরাত্বারোপ করেন ২৩.৪ শতাংশ,২৫শতাংশ সচেতনতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন।তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে,সচেতনতা বৃদ্ধি নারী পুরূষ উভয় উত্তর দাতা একমত পোষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

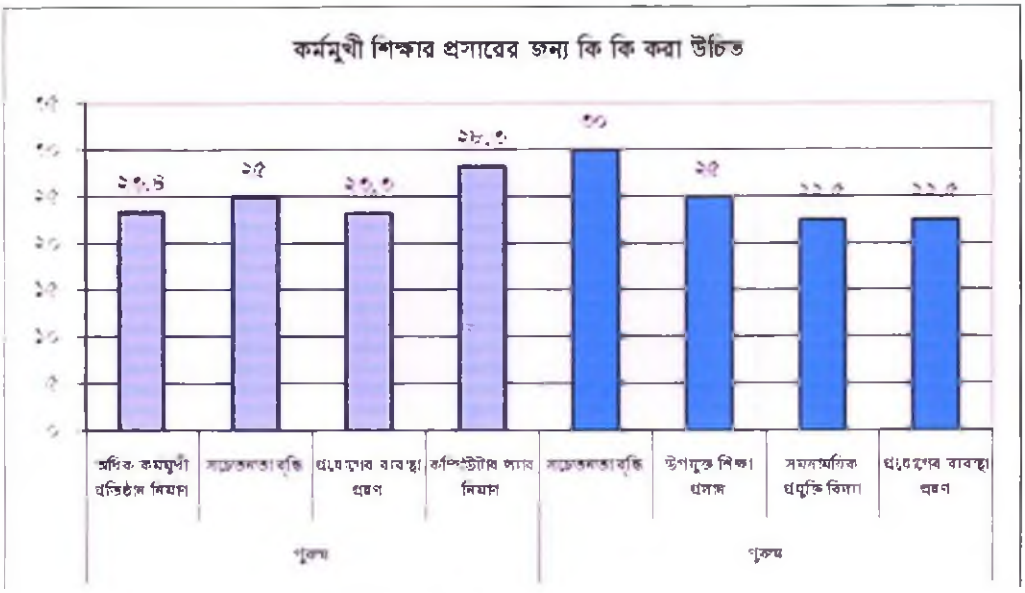

নারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

স্কুলের বেতন, টিউশন ফি, বই, স্টেশনারী ও ইউনিফর্মের মতো মধ্যমিক শিক্ষার ব্যক্তিগত খরচ, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরনে এসব পল্লী পরিবারগুলোর করুণ চিত্র ফুটে উঠে। মাধ্যমিক শিক্ষার বাৎসরিক ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ খরচ ১৯৮৮ সালে প্রতি খাতের জন্য ৫৪ ডলার। এই পরিমান পরিবারের ১৫ শতাংশের জন্য বরাদ্দকৃত আয়ের ১৬ শতাংশ, পরিবারের নিম্নোক্ত ২৩ শতাংশের জন্য ৫৪ শতাংশ, পরবর্তী ৩৩ শতাংশ বন্টনযোগ্য আয় আছে কিন্তু সেটি মাধ্যমিক শিক্ষার খরচ বহন করার মতো যথেষ্ট নয়।

যাইহোক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বালিকাদের না যাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার চেয়ে অধিক জটিল কারণ রয়েছে। একজনকে পছন্দ করার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অধিকাংশ পরিবারই যারা শিক্ষার ব্যয় বাবদ ৭৩ শতাংশ ব্যয় করে, সন্তানদের জন্য তারা তাদেরকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে দেখেছেন। নারী শিক্ষাকে কেবলমাত্র কম মূল্যবান হিসাবে উপলব্ধি করা হয়। যেসব বালিকা বিয়ের উপযুক্ত, বাড়ী ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে হবে গৃহীনি তাদের পেছনে ব্যয় করা নিতান্ত বোকামী বলে মনে করা হয়। অতএব তারা প্রাপ্ত ফান্ডের ২৭ শতাংশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

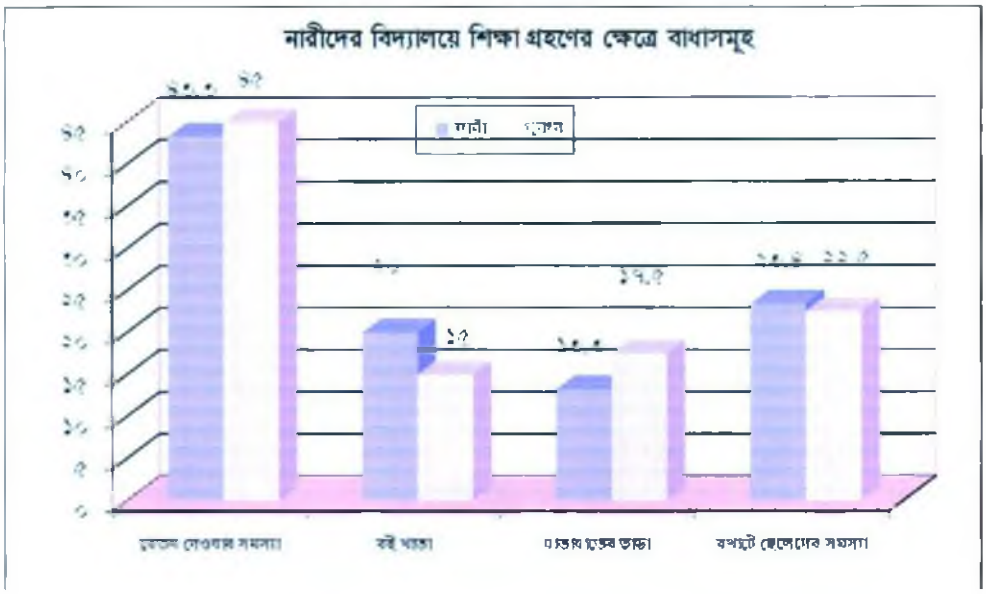

সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও, আমাদের দেশে নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখনও গ্রামে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। অনেকেই মনে করে যে, নারীদের বিয়ে হয়ে গেলে তারা ঘরকন্নার কাজ করবে এবং সংসার ধর্মে আত্মনিয়োগ করবে, সাংসারিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য তা আজ কারও দ্বিমত নেই। আমাদের আলোচ্য গবেষণার দুটো গ্রামের নারী পুরুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ৪৪.৮ শতাংশ নারী আত্মনির্ভরশীলতার বৃদ্ধির কথা বলে। লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসের কথা বলে ৩৯.৬ শতাংশ পুরুষ। তবে এখানে শোষণের মাত্রা কম হয় এ বিষয়ে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে কম উত্তর লক্ষ্য করা যায়।

আপনি কি মনে করেন নারী শিক্ষার প্রয়োজন আছে?

নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
হ্যা	না	হ্যা	না
৫৮ (৯৮.০%)	২ (২.০%)	৩৬ (৯৬.০%)	৪ (৪.০%)

যদি হ্যা হয় তবে কি ধরণের প্রয়োজন

নারী (৫৮)		পুরুষ (৫৬)	
প্রয়োজনীয়তা	নম্বর (শতকরা)	প্রয়োজনীয়তা	নম্বর (শতকরা)
মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি	২৬ (৪৪.৮%)	মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি	২৫ (৪৩.১%)
লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস	২০ (৩৪.৫%)	লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস	২৩ (৩৯.৬%)
নারীদের শোষণের মাত্রা কম হয়	১২ (২০.৭)	নারীদের শোষণের মাত্রা কম হয়	১০ (১৭.৩%)

আমাদের দেশে কয়েকটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যার মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা বিশেষভাবে উলেল্লখযোগ্য। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত তা শহর ও নগরের জন্য একই রকম ;কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যেটা দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামে ও শহরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষার উপর বিশেষ জ্ঞান লাভ পল্লী এলাকার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। এলক্ষ্যে বর্তমান গবেষণায় আমরা জানতে চেয়েছিলাম গ্রামীণ পুরুষ ও নারীদের কাছে তাদের জন্য কোন শিক্ষাটা বেশী উপযোগী। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কথাই তারা বেশী বলেছে। ১৮.৪ শতাংশ নারী কর্মমুখী শিক্ষার কথা বলেছে। অন্যদিকে ২৫ শতাংশ পুরুষ কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন।

আপনি কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে পছন্দ করেন যার মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
শিক্ষা ব্যবস্থা	**নম্বর (শতকরা)**	**শিক্ষা ব্যবস্থা**	**নম্বর (শতকরা)**
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	৩২ (৫৩.৩%)	আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	১৬ (৪০.০%)
উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	১৭ (২৮.৩%)	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা	১৪ (৩৫.০%)
কর্মমুখী শিক্ষা	১১ (১৮.৪%)	কর্মমুখী শিক্ষা	১০ (২৫.০)

গ্রামে নানা ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড- বিদ্যমান। কিন্তু গ্রামীণ নারীরা গৃহস্থ কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকার কারণে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া রয়েছে রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থা যার দরুন তারা ঘরের বাহির হতে পারে না। তবুও সময় বদলেছে নারী এখন স্বাবলম্বী হতে চলেছে। গ্রামে যেসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান তার মধ্যে গবাদি পশু ও ছাগল পালন উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি গবাদি পশু ও ছাগল পালন করে। তবে প্রশিক্ষন কর্মকান্ডে পুরুষদের সংখ্যাই বেশী।

কি কি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

নারী (৬০)		পুরুষ (৪০)	
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র	**নম্বর (শতকরা)**	**অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র**	**নম্বর (শতকরা)**
গবাদি পশু ও ছাগল পালন	৩৪ (৫৬.৭%)	গবাদি পশু ও ছাগল পালন	১৯ (৪৭.৫%)
গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের অন্তর্ভুক্তি	১২ (২০.০%)	গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের অন্তর্ভুক্তি	১১ (২৭.৫%)
সেবা ও প্রশিক্ষন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ	১৪ (২৩.৩%)	সেবা ও প্রশিক্ষন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ	১০ (২৫.০%)

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-১

উম্মে কুলসুম,মহিলা ইউপি সদস্য,গ্রাম-খাইলকৈর,গাছা ইউনিয়ন,গাজীপুর সদর,গাজীপুর, তিনি দীর্ঘদিন ধরে নারী শিক্ষা এবং পল্লী উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন। তিনিও আমাদের রক্ষনশীল মানসিকতা বিশেষত তাদের সময় থেকে চলে আসা সময়টার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন "মেয়েদেরকে এখন গৃহকাজে আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা পল্লী অঞ্চলে প্রকট। অর্থনৈতিক সংকট এবং নিরাপত্তার অভাবও এ জন্য অনেকটা দায়ী"।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন যে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন। কারণ স্বাবলম্বী হওয়ার পর তার প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে গেছে এবং পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি তিনিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হচ্ছেন। মানবাধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে, মুলত মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ৯ম-১০ম শ্রেণী পর্যায়েই বেশি। এজন্য সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি উপবৃত্তি বাড়ানোর পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর আরও বেশি জোর দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তিনি যে এলাকায় কর্মরত আছেন সেখানে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড- বলতে মুলত গবাদি পশু ও ছাগল পালন বুঝায়। তবে প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়ছে মোবাইল ফোন ইত্যাদি। আর নিরাপত্তার অভাব এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতার বিষয়গুলোকেই নারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে তিনি মনে করেন। তার এলাকার এক মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে"।

কেস স্টাডি-২

আলহাজ্ব মো: সিরাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, গ্রাম- কলমেশ্বর, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর, । প্রথমেই তিনি কথা বলেন নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে। মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধির জন্যই শিক্ষা প্রয়োজন বলে তার ধারণা। তবে তার এলাকায় রক্ষণশীল মানসিকতার প্রভাব বেশি থাকায় মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং গৃহকাজে সময় দেওয়ার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা ঝরে পড়ে। এ হার ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্তই বেশি এবং এ সমস্যা সমাধানে উপবৃত্তির হার বাড়ানোর পাশাপাশি পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক এবং কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামোন্নয়নে অবদান রাখার হাতিয়ার বলে মনে করেন। তার বিদ্যালয় এবং এলাকায় কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় বলে তিনি জানান। তার এলাকার নারীরা প্রধানত গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার এলাকার নারীরা যথেষ্ট পিছিয়ে। আর্থ-সামাজিক ও নিরাপত্তার অভাবকে সিরাজুল ইসলাম নারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে দেখেন। এ প্রসঙ্গে মাস কয়েক আগে এলাকার এক বখাটের দ্বারা এক ছাত্রী উত্যক্ত হওয়ার ঘটনা তিনি উল্লেখ করেন। তবে তিনি মনে করেন সামগ্রিক পরিস্থিতি আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে।

কেস স্টাডি-৩

সমীক্ষায় বিভিন্ন সময়ে জেন্ডার বৈষম্য দেখার জন্য একটি পরিবারের তিন প্রজন্ম অর্থাৎ দাদী, মা ও মেয়ের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এরকম একটি সাক্ষাৎকারে দেখা যায়, শাহানারা বেগম যারা বয়স ৫০ বছর। পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্য। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পড়ালেখায় তার বাবার খুব উৎসাহ ছিলো। কিন্তু বেশি পড়ালেখা করতে পারেননি, কারণ হাইস্কুল তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিলো। ফলে তার দাদা চাইতেন না তিনি বাড়ী থেকে এতদূরে যান। এছাড়াও তার দাদী ও ফুফুও চাইতেন না যে তিনি পড়ালেখা করুক। তার দাদীর মতে মেয়েদের বেশি পড়ালেখা করতে নেই। তাদের ঘর সংসার জরুরি, পড়ালেখা নয়। কিন্তু ভাইয়েরা পড়ালেখা করেছে।

শাহানারা বেগমের দুই ছেলে। ছেলেরা অনেক ছোট থাকতে তার স্বামী মারা যায়। অনেক কষ্টে তিনি তাঁর দুই ছেলেকে পড়ালেখা করিয়েছেন। তিনি বলেন, তার যদি মেয়ে থাকতো তবে মেয়েকেও পড়ালেখা করাতেন। তিনি যা পারেননি তা অবশ্যই মেয়েকে দিয়ে করাতেন।

আবার ফেরদৌসি বেগম (বয়স ৩২ বছর)। তিনি শাহানারা বেগমের বড় ছেলের বৌ। ফেরদৌসী বেগম এসএসসি পাশ। তাঁর পড়ালেখায় উৎসাহ দিয়েছেন তার বাবা। তাঁর এসএসসি পরীক্ষার পর তার আত্মীয় স্বজনদের মত ছিলে- মেয়ে অনেক লেখাপড়া করেছে, আর প্রয়োজন নেই। সেজন্য তার বাবাকে সমসময় তার বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হতো। ফলে পরীক্ষার পরপরই তার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তার ভাইয়েরা বিএ পাশ করেছে।

আর ফেরদৌসী বেগমের এক মেয়ে। সে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। বিয়ের কয়েক বছর পরেই তার স্বামী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। ফলে তার পরিবারের আয় যথেষ্ট নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার মেয়ের লেখাপড়া করাচ্ছেন। তিনি বলেন মেয়েকে অবশ্যই এমএ পাশ করাবেন এবং চাকরি করাবেন। প্রয়োজন পড়লে তিনি যেকোনো কাজ করে মেয়েকে পড়ালেখা শেখাবেন।

দুলারী। বয়স ১৪ বছর। ফেরদৌসী বেগমের মেয়ে এবং শাহানারা বেগমের নাতি। দুলারী সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তাঁর পড়ালেখায় তার বাবা-মা ছাড়াও দাদী, দাদা, চাচা-মামা সবাই উৎসাহ দেয়। সে উচ্চশিক্ষিত হতে চায় এবং চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশমালা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশমালা

স্মরণাতীতকাল থেকে নারীরা আমাদের সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অধিক (৪৯%) হলো নারী যাদের মধ্যে ৪৫.৬ শতাংশ কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ নারীর কাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে গৃহস্থ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যাইহোক, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটার পর নারীরা ঐতিহ্যগত লোকনীতি ভেঙ্গে তাদের বাড়ীর বাইরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বেরিয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা তাদের পরিবার ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসল উৎপাদন, ফসল কাটার পরবর্তী কার্যসমূহ, পোল্ট্রি পালন, গবাদি পশু ও মৎস্যের ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ ও বিভিন্ন ধরণের আয় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র পরিবারের নারীদের আয়-উদ্দীপনামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বেশী কারণ এসব পরিবারগুলোতে সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী পুরুষ উপার্জনকারী পরিবারগুলোর চেয়ে। তারা ঘনিষ্টভাবে কৃষি কর্মকাণ্ডের সব phase-এর সাথে যুক্ত। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা ও প্রক্রিয়াজাতকরন পর্যন্ত তারা বিভিন্ন ধরনের জামা সেলাই, ঝুড়ি তৈরি, কাগজ তৈরি, ফুলদানি, পোল্ট্রি পালন ও গবাদিপশু পালন এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র পর্যায়ের ব্যবসা, এমনকি দরিদ্রতম পরিবারগুলোর নারীরা মাঝে মাঝে তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য মজুরীর বিনিময়ে বাড়ীর বাইরে কাজ করে।

যদিও বাংলাদেশী নারীরা ঘরে ও ঘরের বাইরে উভয় স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তবুও এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সুবিধা, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে, জাতিসংঘ জেন্ডার সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক অণুসারে, বাংলাদেশের অবস্থান ১১৭টি দেশের মধ্যে ১০৫তম। অতএব, বাংলাদেশী নারীরা সুবিধাবঞ্চিত এবং কম ক্ষমতাবান।

এই বাস্তবতা বিবেচনা করে আমাদের উন্নয়ন অংশীদাররা এবং ডোনার এজেন্সিগুলো জেন্ডার অসমতা কমানোর সব ধরনের কর্মকাণ্ডে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। এভাবে সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। উপরন্তু, নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতির জন্য গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকা, মহিলা সবুজ সংঘ এবং আর.ডি.আর.এস এর মতো ক্ষুদ্র ঋণ এনজিওগুলোর মাধ্যমে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিওগুলো সমাজের বঞ্চিত অংশ বিশেষ করে নারীদের সহায়তা করে যাচ্ছে, কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে আয়-

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন, শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা, নিরাপদ পায়খানা, আইনগত সহযোগিতা ও বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন।

১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে নিম্ন প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীকে উচ্চ প্রাথমিক স্তর নামকরণ।

২.সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করতে হবে;

৩. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৩২- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৪.নির্ধারিত প্রাথমিক শিক্ষা এলাকায় প্রত্যেক শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করবে;

৫.বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা নিশ্চিত করবে;

৬.প্রাথমিক শিক্ষা বয়সযোগ্য সকল শিশুর নাম, বয়স ও অভিভাবকের নাম সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত;

৭.ভর্তি হতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য শিশুদের নামের তালিকা পৃথকভাবে প্রদর্শন করবে;

৮.তালিকার একটি কপি প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড হতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এলাকায় বিদ্যালয়সমূহে প্রেরণ করবে;

৯.বিদ্যালয় প্রধান প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে তার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া শিশুদের নামের তালিকা শিক্ষা কমিটি এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন;

১০.কমিটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ভর্তি হয়নি এমন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও যথারীতি উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

১১. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা;

১২. সমন্বিত ও কল্যাণধর্মী জীবনযাপনের জন্য সচেতন কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ সৎ ও প্রগতিশীল জীবন যাপন দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা;

১৩. দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশলী জনশক্তি সরবরাহ করা;

১৪. মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষৎ গবেষণার জন্য নির্দেশনা

ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি প্রত্যয় যা আয় লেভেল কিংবা বস্তুগত সম্পত্তিতে অধিকারের সাথে সম্পর্কিত । জনগণকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করা যথাযথ জ্ঞান দান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নতি বিধান এবং তাদের প্রান্তিক সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ইত্যাদি বিষয় ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি বাংলাদেশের পল্লী নারীদের জন্য বিশেষভাবে সত্য। যারা ঐতিহ্য, পূর্ব সংস্কার, কুসংস্কার এবং দারিদ্র্যের শৃংখলে আবদ্ধ তাদের ক্ষমতায়ন জনগণের উন্নয়নে বিশেষ পরিপূর্ণতা দান করে। প্রযুক্তিগত ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষন ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

এটা লক্ষ্যনীয় যে, নারীরা বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ করছে। এসব পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি খাত বেশ গুরুত্বপূর্ণ- যেমন ভূমিহীনতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যার চাপ।

১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৯-২০০০ সাল, মাত্র এই ৪ বছরের মধ্যে শ্রম শক্তি জরীপ অনুসারে, অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ৩.৭ শতাংশের গড় বাৎসরিক আয়ের সমপরিমান (বিবিএস, ২০০০)। যাই হোক, আয় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর বর্দ্ধিত অংশগ্রহণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্ন মজুরীর ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, বন ও মৎস্য চাষে। এ খাতে নারী কর্মসংস্থান বাৎসরিকভাবে ৪১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে অন্যান্য খাতে শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মসূচী প্রয়োজন। বৃদ্ধির হার তাৎপর্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, উৎপাদনখাতে প্রবৃদ্ধি মাত্র ২.৭ শতাংশ, এই ১.২ মিলিয়ন নারী ২০০০ সালে পল্লী এলাকায় দিন মজুরের কাজ করছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের গড় মজুরী আনুমানিক ৫৫ শতাংশ।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, যদিও নারীরা ব্যাপক হারে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরি পাচ্ছে, কিংবা এমন কোন পেশায় নিয়োজিত যেখানে কোন সাক্ষরতা কিংবা দক্ষতার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই। অধিকাংশই সেখানে দিন মজুরের কাজ করছে এবং পুরুষের তুলনায় খুব সামান্য মজুরী পাচ্ছে। যাই হোক, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার ফলে, অসংখ্য নারী মুরগী পালন, গবাদী পশু ও ছাগল পালন করছে। এভাবে নারীরা আত্ম কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে। সংক্ষেপে, পল্লীর কর্মজীবি নারীদের বেশীরভাগই দিন মজুর কিংবা মজুরীহীন গৃহ শ্রমের মতো নিম্ন আয়ের কর্মকাণ্ডে যুক্ত। যেহেতু এসব নারীদের সাক্ষরতা/ মৌলিকা শিক্ষা ও দক্ষতার প্রশিক্ষনের অভাব আছে তাই তাদের প্রান্তিক উৎপাদন এবং আয় খুব নিম্ন পর্যায়ে থাকে।

গবেষকরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষনের গুরুত্বের উপর জোর দিবেন। যাই হোক, নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষন কেবল যে ক্ষুদ্র ঋণের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে তাই নয় এই ইতিবাচক প্রভাবও ব্যপক।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও বালিকাদের শিক্ষা তাদের নিজেদের উন্নয়নের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, তাই তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের উপরও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়নের প্রত্যেকটি মাত্রার উপর ক্যাটালিস্টিক প্রভাব রয়েছে ।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপর্যাপ্ত, যা পারিবারিক জীবনে নারীর সমান মর্যাদায় প্রতিফলিত করে। তাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করে, বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও নির্যাতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ক্ষেত্রে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিলোপ চলমান শিক্ষার মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন এবং এসব বিষয় কারিকুলামে অন্তভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের এনজিও গুলো সীমিত আকারে হলেও চলমান শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল ইস্যুগুলোর অগ্রগতি সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, ক্যাম্প, ভার্ক, আরডিআরএস এর মতো সংগঠন জেন্ডার ইস্যু সম্বলিত শিক্ষাকে চালিয়ে নিতে বিষয়বস্তুর উন্নতি বিধান করছে। এসব বিষয়বস্তুর মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে তাদের সার্থক ভূমিকা সম্পর্কে নারীদের সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে ।

ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ৪টি বড় ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন- (১) আয়ের উপর নিয়ন্ত্রন (২) শ্রম শক্তির উপর নিয়ন্ত্রন (৩) প্রাকৃতিক সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রন (৪) জ্ঞানের উপর নিয়ন্ত্রন । শিক্ষা এসব উপাদানগুলোর প্রত্যেকটির উপর নারীর নিয়ন্ত্রনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষুদ্র ঋনের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে আয়ের উপর নিয়ন্ত্রন অর্জন করা যায়। বংশ পরম্পরায় পল্লীর মানুষ অনেক দেশজ, ঐতিহ্যগত জিনিসের উপর দক্ষতা অর্জন ও প্রযুক্তিগত ব্যবহার চালিয়ে এসেছে। এগুলোর অনেকই জনগণ সাধারণ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শেখে, এর কিছু উদাহরণ হলো ঋতুভিত্তিক গুড় তৈরি, বেতের উপর পুড়িয়ে নকশা করা, মাছ নোনা করা এবং মাছ মাংস শুটকি, পনির ও মাখন প্রস্তুত করা এবং শাকসব্জির রক্ষনাবেক্ষন ইত্যাদি। বিচিত্র দক্ষতাও স্থানীয় চাহিদা পূরন করে এবং পল্লী এলাকায় হস্তশিল্পে নিয়োজিত লোকগুলো সামান্য উপার্জন করে। এই স্থানীয় উৎপাদন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হলো খরচ কম কিংবা ব্যয়হীন প্রক্রিয়া, প্রায় শতভাগ স্থানীয়ভাবে যোগানকৃত প্রাকৃতিক কাচামাল এবং সর্বোপরী এই প্রক্রিয়ার সরলতা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই এখন পন্যের বাজারজাতকরণ এবং দক্ষতার উন্নয়নের সমর্থনের অভাবে নিম্নে চলে গেছে। যদি গৃহীত মূলনীতিগুলো শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং জনগণের দক্ষতার যদি অগ্রগতি ঘটে শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সমন্বয়ের ফলে, তাহলে এই গতানুগতিক স্থানীয় উৎপাদন কৌশলকে স্থানীয় শিল্পে রূপান্তরিত করা যায় এবং পন্যগুলো

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাজার পায়। দক্ষতার এই অগ্রগতি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। এটি ছোট ও মাঝারি লেভেলের শিল্পের মাধ্যমে শক্তি বাড়াতে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার আদর্শ হতে পারে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

পল্লী শিক্ষা পল্লী এলাকায় পন্য উৎপাদনের জন্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে এবং সেগুলোর আরো দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বাজারজাত করা হয় যাতে ছাত্র ছাত্রীরা প্রয়োজীয় পরিচিতি লাভ করতে পারে এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থপঞ্জী

- সৈয়দ আবুল মকসুদ,পথিকৃৎ নারীবাদ খায়রুননেসা খাতুন,ঢাকা ১৯৯৮,পৃ-১৮।
- আবদুলস্নাহ আল মুতী, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯২-৯৩
- আবদুলস্নাহ আল মুতী, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৬।
- আবু হামিদ লতিফ, বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৬।
- আবুল আহসান চৌধুরী,আজিজুন নেসা খাতুন,ঢাকা ১৯৯৬,পৃ-১৪
- প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা,মাধ্যমিক শিক্ষায় বর্তমান ও ভবিষৎ,জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ,৯৮,প্রতিবেদন,শিক্ষা মন্ত্রনালয়,পৃ-৩৮।
- প্রফেসর মুজিরউদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ৪৮-৫৬।
- ESCAP, বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯২
- বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্টাটিসটিকস, বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯২
- মুনতাসির মামুন, "উনিশ শতকের পূর্ববাংলায় সভা সমিতি" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বও ১৯৮৩, ৬৩-১২৫।
- কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্ত্রীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।
- শাহিদা পারভীন, 'বেগম শামসুন্নাহার মুহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি (
- শরিফা খাতুন, আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকের বাংলার নারী সমাজ, এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, (ঢাকা ১৯৮৫)।
- শরিফা খুতুন রচিত "আধুনিক শিক্ষা" গ্রন্থেও ২৯০ পৃষ্ঠা
- শীলা বসু, "রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলার মুসলিম নারীশিক্ষার বিকাশ" ঐতিহাসিক, ২ এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যা, কলকাতা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণপকার, শিক্ষা,সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, মে ১৯৭৪, পৃ-২৩.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ-৬২।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন,১৯৯৭,পৃ পৃ-৪১-৪২।
- চ্যাম্বার,রবার্ট,Rural development,1985
- বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
- বিশ্বব্যাংক,বাৎস্যরিক রিপোর্ট,১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

- ADB(2001) Women in bangladesh.country briefing Paper.Manilla:Asian development Bank
- Ahmed F (2001) gender Division of Labour:Bangladesh Context,Steps Towards Development,6(1),7-26
- anderson,j.(1996) yes,But is it empowerment? Initiation, implementation and outcomes of community action,PP-69-83
- Chen,M and Mahmud,S (1995) Assessing change in women's lives:a conceptual framework,working paper no-2,BRAC-ICDDR,B Joint project at Matlab,Dhaka.
- David Kopf. Brahmo Samaj, 16, 34.53
- Directorate of Primary Education (DPE), Monitoring Cell, June 1998.
- Epstein,T,S(1986) Socio-cultural and attitudinal factors Affecting the status of women,P-64,in A.K Gupta (ed) women and society,New Delhi,
- Fifth Five Year Plan (1997-2002), Chapter XX, Review of Fourth Five Year Plan, page-427.
- Friedmann,J.(1992) empowerment:the politics of alternative development,cambridge:blackwell publishing.
- GoB,Report of the sub committee to determine the mechanism for *deputation of the officials belonging to the transformed subjects* to the Upazilla Parishad,cabinet Division,Dhaka,1984 ,p-8
- Ibid,2001
- Islam,M (2000) women look forward ,p-4,in ,M Ahmed(ed) Bangladesh in the New Millenium,Dhaka:Community Development Library
- Kabeer,N (1999) Resources ,agency,Achievements reflections on the measurement of women's empowerment,Development and change,p-435-464.
- Khatun,T,(2002) gender-related development Index for 64 Districts of bangladesh,CPD_UNFPA Programme and sustainable development
- Lazo,L(1995) some reflections on the empowerment of women'pp23-37,
- M.K.U. Molla, Women's Education in Early Twentieth Century Bengal in the Bengal Studies. University of Michigan, East Lansing, 1985.
- Mahbub-ul Huq Human Development Center: (2000): Human Development in South Asia- 2000: The Gender Question. University Press Limited, Dhaka.
- Meredith Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905. (Princeton 1984).
- Ministry of Women and Children Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh: (1999): Gender Dimensions in Development - Statistics of Bangladesh, Dhaka.
- Mosharaf Hossain and Anisatul Fatema Yousef: (2001) Future of Girls' Education in Bangladesh: Academy for Planning and Development, Dhaka.
- Muskotwane,R and Siwale ,R.M (2001) Gender awareness and Sentitization in Basic Education,paris :UNESCO basic Education Division.
- NCBP(2000) Gender Equality,development and Peace for the twenty first century-NGO committee in Beijing :Women for women
- NFPE phase-3(2000,Annual report,BRAC,Dhaka-2000)

Dhaka University Institutional Repository

- POPIN(1995) Guidelines on women's Empowerment for the UN Resident Co-ordinator System,United nations population Information network.
- Sebstad,J and Cohen,m (2000) Microfinance Risk Management and Poverty ,Washington DC
- Sen,G.and Batliwala,S(2000) Women's empowerment and Demographic processess,Moving Beyond Cairo,PP 95-118.
- Shamima Ahmed: (2001) "Gender and Primary and Mass Education", Paper pesented at the. National Workshop on Gender and Education, organized by Steps Towards Development, Dhaka.
- Sonia Nishat Amin, "Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Renaissance", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 24:2(1988). 185-192.
- Stromquist,P.N (1995) The theoretical and Practical bases for Empowerment,PP,13-22
- The Dakar framework for Action,Dakar,Senegal,2000
- UNFPA: (1994) Program of Action adopted at the ICPD, Cairo, September.
- William Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar, (1868), 132

Dhaka University Institutional Repository

- পরিশিষ্ট-২

"নারী উন্নয়ন ও পল্লী শিক্ষা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ"বিষয়ক গবেষনা কর্মের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা

ক. উত্তবদাতাব নাম:
খ. বর্তমান ঠিকানা:
বয়স: শিক্ষা: পেশা/পদবী:

১. এ এলাকায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে যেতে কোন সমস্যা হয় কি না!

হ্যা না

যদি হ্যা হয় তবে কি ধরণের সমস্যা

ক. বিদ্যালয় বাড়ী থেকে অনেক দূরে
খ. রাস্তায় বখাটে ছেলেদের উৎপাত
গ. রক্ষনশীল মনমানসিকতা

২. আপনি কি মনে করেন নারী শিক্ষার প্রয়োজন আছে?

হ্যা না

যদি হ্যা হয় তবে কি ধরণের প্রয়োজন

ক. মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি
খ. লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস
গ. নারীদের শোষণের মাত্রা কম হয়

৩. অত্র এলাকায় বিদ্যালয়গামী মেয়েদের ঝরে পড়ার কারণ কি?

ক. অর্থনৈতিক সংকট
খ. গ্রহকাজে নারীদের সময় দিতে হয়
গ. নারীদের শিক্ষা গ্রহণে অনীহা

৪. আপনার এলাকায় বিদ্যামান সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে আপনার ছাত্র ছাত্রীরা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী শিক্ষা লাভ করছে?

৫. আপনার এলাকায় কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত মেয়েদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশী এবং কেন? ৬. আপনি কি মনে করেন নারীদের উপবৃত্তি বাড়ানো উচিত? যদি হ্যা হয় তবে কি পরিমান বৃদ্ধি করা উচিত।

ক. ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী
খ. ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী
গ. ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী
ঘ. ৯ম থেকে ১০ শ্রেণী

Dhaka University Institutional Repository

৬. আপনি কি মনে করেন নারীদের উপবৃত্তি বাড়ানো উচিত?

হ্যা না

যদি হ্যা হয় তবে কি পরিমান বৃদ্ধি করা উচিত।

ক. মাসিক ২০০০ টাকা

খ. মাসিক ২৫০০ টাকা

গ. মাসিক ৩০০০ টাকা

৭. আপনি কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে পছন্দ করেন যার মাধ্যমে নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

ক. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

খ. উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

গ. কর্মমুখী শিক্ষা

৮. আপনার এলাকায় কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, যদি না থাকে তবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের জন্য কি কি করা উচিত।

৯. কি কি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে।

ক. গবাদি পশু ও ছাগল পালন

খ. গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের অন্তর্ভুক্তি

গ. সেবা ও প্রশিক্ষন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ

১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের পরিমান কতটুকু।

ক. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

খ. ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার

গ. গ্রামের বিচারে নারী মাতবর

ঘ. পল্লী চিকিৎসক

১১. নারীরা এখন কি কি প্রযুক্তি ব্যবহার করছে?

ক. সলাই মেশিন

১২. নারীদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কি কি?

ক. বেতন দেওয়ার সমস্যা

খ. বই খাতা

গ. যাতায়াতের ভাড়া

ঘ. ইউনিফর্ম সমস্যা

ঙ. বখাটে ছেলেদের সমস্যা

১৩. বাংলাদেশের নারী ও পুরুষ শিক্ষার বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

১৪. প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ও ঝরে পড়া বালক বালিকাদের তুলনামূলক চিত্র

১৫. মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ও ঝরে পড়া বালক বালিকাদের তুলনামূলক চিত্র